প্রকাশ থাকে যে, মানুষের দেহ যে কোন পাত্র অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু শরাব ফেলিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণে যদি উহাকে যখম করার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তো শরাবের পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলার বৈধতা আরো উত্তমভাবেই স্বীকৃত হইবে।

অনিষ্ট দমন, শাস্তি ও প্রতিরোধ

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, শরাবের পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলা, জবর দখলকৃত বাড়ী হইতে দখলকারীকে টানা হেঁচড়া করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া- অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং উহার শাস্তি হিসাবে জায়েজ হওয়া উচিত ছিল। এই বক্তব্যের জবাব হইল, অন্যায়ের প্রতিরোধ বা ভীতি প্রদর্শনের বিষয়টি ভবিষ্যৎ কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। শাস্তি প্রদান করা হয় কোন অতীত কর্মের পরিণাম হিসাবে। আর দমন করার বিষয়টি উপস্থিত অনিষ্টের সহিত সম্পৃক্ত। তো সাধারণ মানুষের পক্ষে কেবল এই শেষোক্ত দমন ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নাই। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ উপস্থিত কোন অন্যায়কর্ম দেখিলে উহা দমন করিবে। এতদ্ব্যতীত আর যাহাকিছু করা হইবে হয় তাহা কোন অপরাধের শাস্তি বা ভবিষ্যৎ কর্মের প্রতিরোধ ও ভীতিপ্রদর্শন রূপেই গণ্য হইবে। অথচ শাস্তি প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন কেবল শাসনকর্তার এখতিয়ারভুক্ত। সাধারণ মানুষ না অতীত অপরাধের জন্য কাহাকেও শাস্তি দিতে পারিবে, আর না ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য কোন অপরাধের বরাবরে ভীতি প্রদর্শন করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ স্তর ঃ ধমক ও ভীতি প্রদর্শন

ইহ্‌তিসাবের ষষ্ঠ স্তর হইল, ধমক দেওয়া ও ভীতি প্রদর্শন করা। যেমন অপরাধীকে এইরূপ বলা যে, তুমি যদি এইরূপ কর, তবে তোমার মাথা ফাটাইয়া ফেলিবে। কিংবা তোমাকে শায়েস্তা করিব বা শায়েস্তা করার হুকুম দেওয়া হইবে- অর্থাৎ সতর্কীকরণের এইজাতীয় কোন শব্দ ব্যবহার করা। তবে শর্ত হইল, যাহা বলা হইবে তাহা করার সামর্থ্য থাকিতে হইবে। এই স্তরটির আদব হইল, কখনো এমন সাবধানবাণী উচ্চারণ করিবে না যাহা বাস্তবায়নের ক্ষমতা নাই। যেমন, কখনো এইরূপ বলিবে না যে, তোমার বাড়ী-ঘর দখল করিয়া লইব, তোমার ছেলেকে মারিয়া ফেলিব কিংবা তোমার স্ত্রীকে আটক করিয়া রাখিব- ইত্যাদি।

এইরূপ সতর্কীকরণ ও সাবধানবাণী যদি বাস্তবায়নের নিয়তে করা হয়, তবে তাহা হারাম। আর বাস্তবায়ন না করার নিয়তে করা হইলে তাহা হইবে মিথ্যা। অবশ্য অপরাধী যদি এই ধরনের ধমকে প্রভাবিত না হয়, তবে নিষেধকারীর পক্ষে এই পর্যন্ত বলার অনুমতি আছে যাহা অপরাধীর অবস্থার সহিত

সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাবধানকারী কথা বলার সময় তাহার অন্তরের নিয়তের বরাবরে মুখে যদি কিছুটা বাড়াবাড়িও করে তবে তাহাও জায়েজ। তবে শর্ত হইল, তাহার এই একীন থাকিতে হইবে যে, এই বাড়াবাড়ি দ্বারা অপরাধী প্রভাবিত হইয়া স্বীয় অপরাধ হইতে ফিরিয়া আসিবে। এই ধরনের বাড়াবাড়ি মিথ্যার মধ্যে গণ্য নহে। বরং ইহাকে বলা হয়, অতিরঞ্জন। বস্তুতঃ এই জাতীয় ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের অতিরঞ্জন এই কারণে জায়েজ যে, ইহার মূল লক্ষ্য হইতেছে অপরাধীর সংশোধন। যেমন দুইজন শত্রুর মধ্যে সন্ধি স্থাপন ও বিবদমান দুই সতীনের মনোমালিন্য দূর করার ক্ষেত্রেও এইরূপ অতিরঞ্জন জায়েজ।

সপ্তম স্তর ঃ প্রহার করা

ইহ্‌তিসাবের সপ্তম স্তর হইল, প্রহার করা। প্রয়োজনে সাধারণ মানুষও এই পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে। এই ক্ষেত্রেও কেবল যতটুকু প্রয়োজন সেই পরিমাণই করিবে- উহার অতিরিক্ত নহে। আর অপরাধ দমন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা গুটাইয়া লইবে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার পর আর প্রহার করা জায়েজ নহে। উহার উদাহরণ যেন এইরূপ-

জনৈক কাজী এক ব্যক্তিকে কাহারো কোন হক নষ্ট করার অপরাধে বন্দী করিয়া রাখিল, কিন্তু বন্দী করিবার পরও যদি লোকটি সেই হক আদায় করিতে অস্বীকার করিয়া নিজের অবস্থানে অটল থাকে, আর কাজী নিশ্চিতভাবে ইহা জানিতে পারে যে, লোকটি সেই হক আদায় করিতে সক্ষম বটে কিন্তু নিছক আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও গোয়ার্তুমির কারণেই সেই হক আদায় করিতে সে অস্বীকার করিতেছে- তবে এই ক্ষেত্রে তিনি কয়েদীকে সেই হক আদায়ে স্বীকারুক্তি আদায় পর্যন্ত প্রয়োজন পরিমাণ শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন। তদ্রূপ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীর জন্যও এই একই হুকুম। অন্যায়ের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পরিমাণ প্রহার করা যাইবে। যদি অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন হয় এবং অন্যায় প্রতিরোধকারীর এই একীন হয় যে, অপরাধী অস্ত্র দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িবে কিংবা অস্ত্রের আঘাতে আহত হইয়া সংশ্লিষ্ট অপরাধ হইতে তওবা করিয়া লইবে, তবে সেই ক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণেরও অনুমতি আছে। তবে শর্ত হইল, কোনরূপ ফেৎনার আশংকা যেন না থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ, কোন পাপিষ্ঠ হয়ত কোন নারীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে বা কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেছে। এখন এই পাপিষ্ঠ অপরাধী ও অন্যায় প্রতিরোধকারীর মধ্যখানে একটি খাল যাহা অতিক্রম করিয়া অপরাধীকে ধরা সম্ভব নহে। এমতাবস্থায় অন্যায়-প্রতিরোধকারী তাহার বন্দুক উঠাইয়া চিৎকার করিয়া অপরাধীকে সতর্ক করিতে পারিবে এবং এমন হুমকিও দিতে পারিবে যে,

তুমি যদি এখুনি মহিলাকে ত্যাগ না কর বা বাজনা বন্ধ না কর, তবে আমি গুলি করিতে বাধ্য হইব। এই সাবধানবাণীর পরও যদি অপরাধী সতর্ক না হয় এবং পূর্বোক্ত অপরাধে বহাল থাকে, তবে এই ক্ষেত্রে গুলি বর্ষণ করা জায়েজ। তবে গুলি করার ক্ষেত্রে সেই পূর্বোক্ত সতর্কতা আবশ্যক। অর্থাৎ এমন কোন অঙ্গে গুলি করা যাইবে না, যেখানে গুলি বিদ্ধ হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৃত্যু ঘটিতে পারে। সুতরাং হাতে বা পায়ে গুলি করিবে। তীর বা তলোয়ার দ্বারা আঘাত করার ক্ষেত্রেও এই একই হুকুম।

অষ্টম স্তরঃ অন্যায়ের প্রতিরোধে সাহায্য কামনা

ইহ্‌তিসাবের অষ্টম স্তর হইল, অন্যায়ের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অপরের সাহায্য কামনা করা। অর্থাৎ এককভাবে নিজের পক্ষে যদি অন্যায়ের প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয়, তবে প্রয়োজনবোধে এইরূপ কামনা করা যে, কিছু লোক জড়ো হইয়া যেন এই কাজে আমাকে সাহায্য করে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশ গ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে এমন হওয়াও বিচিত্র নহে যে, অপরাধীও তাহার নিজস্ব লোকজনকে জড়ো করিয়া প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবে এবং পরিণতিতে ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও খুনাখুনির মত অবস্থা সৃষ্টি হইবে।

এইরূপ পরিস্থিতিতে শাসনকর্তার অনুমতি ছাড়া চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে কি-না এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে অন্যায় প্রতিরোধের অনুমতি দেওয়া যাইবে না। কেননা, উহার ফলে দুই পক্ষে লড়াই বাঁধিয়া চরম হানাহানি ও ফেৎনা-ফাসাদ ছড়াইয়া পড়ার আশংকা রহিয়াছে।

আবার কেহ কেহ বলেন, এই ক্ষেত্রে শাসনকর্তার অনুমতি আবশ্যক নহে। এই বক্তব্যই যুক্তিসঙ্গত। কেননা, ইতিপূর্বে ইহ্‌তিসাবের যেইসব স্তর বর্ণিত হইয়াছে, যেমন– ওয়াজ-নসীহত, তিরস্কার ও কঠোরতা, হাত দ্বারা বাঁধা প্রদান, ভীতিপ্রদর্শন, প্রহার, এমনকি প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণের ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এখন সবশেষ যেই স্তরটির কথা আলোচনা করা হইতেছে, এই ক্ষেত্রে অবশ্য উভয় পক্ষই নিজ নিজ পক্ষের লোকদিগকে সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া যুদ্ধের মত অবস্থা সৃষ্টি হয় বটে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সৎ কাজের আদেশের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কঠিন কোন পরিণতিকেও ভ্রূক্ষেপ করা যাইবে না। নিজের পক্ষের লোকদিগকে সাহায্যের জন্য আহবানের পিছনে সৎ কাজের আদেশদাতার লক্ষ্য থাকে– যেন আল্লাহ পাকের রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে অপরাধীগণকে পরাস্ত করার জন্য লোকেরা একত্রিত হইয়া জেহাদে অবতীর্ণ হয়। অন্যায় প্রতিরোধকারীর এই পদক্ষেপে ক্ষতিকর কোন

দিক নাই। মুজাহিদ্বীনদের পক্ষে যেমন নিজেরা একত্রিত হইয়া কুফরী ও শেরেকী নির্মূলের উদ্দেশ্যে কাফেরদের যে কোন দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েজ, তদ্রূপ মুহ্‌তাসিব তথা অন্যায় প্রতিরোধকারীর পক্ষেও নিজেদের লোকজন জড়ো করিয়া ফেৎনা-ফাসাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা জায়েজ। এই দুই অবস্থার মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। বর্ণিত অবস্থায় কাফেরদের হত্যা করিতে যেমন কোন আপত্তি নাই, তদ্রূপ যেই ফাসেক নিজের অপরাধে অটল থাকার উদ্দেশ্যে হক পন্থীদের সঙ্গে লড়াই করে, তাহাকে হত্যা করিতেও কোন নিষেধ নাই। কাফেরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে মৃত্যুবরণকারী মুসলমান যেমন শহীদ হইবে, তদ্রূপ অন্যায় প্রতিরোধকারী ব্যক্তি হকের উপর থাকিয়া যদি মজলুম অবস্থায় মারা যায়, তবে সেও শহীদ হইবে।

উপরে ইহ্‌তিসাবের যেই স্তরটির কথা আলোচনা করা হইল, এইরূপ অবস্থা সচরাচর খুব কমই দৃষ্ট হয়। কিন্তু কখনো এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইলে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে কেয়াসের দাবী কি, তাহা জানা থাকা আবশ্যক। সুতরাং কেয়াসের এই ধারা বিলুপ্ত করার কোন প্রয়োজন নাই এবং যথাস্থানে তাহা বহাল রাখিতে হইবে। যাহাই হউক, সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল– যেই ব্যক্তি অন্যায় দমন করিতে সক্ষম, সে হাতের দ্বারা কিংবা অস্ত্র দ্বারা তাহা দমন করিবে। সম্ভব হইলে একা করিবে কিংবা নিজস্ব লোকদের সহযোগিতা লইয়া সম্মিলিতভাবে করিবে। অর্থাৎ যেইভাবে সম্ভব হয় সেইভাবেই করা জায়েজ।

মুহ্‌তাসিবের আদব

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকে বলা হয় ইহ্‌তিসাব। আর যেই ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে, তাহাকে বলা হয় 'মুহ্‌তাসিব'। মুহ্‌তাসিবের আদব কি তাহা ইতিপূর্বেই ইহ্‌তিসাবের স্তরসমূহের আলোচনায় উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা উহার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলিয়া ধরার প্রয়াস পাইব।

যেই ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিবে, তাহার মধ্যে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। যথা– এলেম, পরহেজগারী ও সৎ চরিত্র। এলেম এই কারণে আবশ্যক যে, উহার ফলে কখন, কি পরিমাণ ও কোন্ পরিস্থিতিতে আদেশ-নিষেধ করিতে হইবে এবং উহার আসবাব ও প্রতিবন্ধক কি এই বিষয়ে যেন সুস্পষ্ট ধারণা থাকে।

পরহেজগারী এই কারণে আবশ্যক যে, তাহার যাহা কিছু জানা আছে উহার বিপরীত কর্ম যেন না করে। অর্থাৎ অনেক জ্ঞানী লোককে দেখা যায়, তাহারা নিজেদের এলেম ও জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে না। বরং তাহারা যে

ইহ্‌তিসাবের ক্ষেত্রে শরীয়তের সীমা লংঘন করিতেছে, এই কথা জানা থাকা সত্ত্বেও সতর্ক হয় না। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে হয়ত নিজের কোন ব্যক্তি স্বার্থ যেমন নিজের এলেমের প্রচার, সুখ্যাতি অর্জন ইত্যাদি কারণে আদেশ নিষেধ অব্যাহত রাখে। এখন তাহাদের মধ্যে যদি এলেমের পাশাপাশি পরহেজগারী বিদ্যমান থাকিত, তবে নিশ্চয়ই তাহারা নিজেদের সীমালংঘন বিষয়ে অবগত হওয়ার পর এই আমল ত্যাগ করিত।

সুতরাং এমন ব্যক্তির পক্ষে আদেশ-নিষেধ করা উচিৎ, যার বয়ানে তাছীর হয় এবং মানুষ যার নসীহত কবুল করে। এই গুণটি পরহেজগার ব্যক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়। যেই ব্যক্তি ফাসেক ও তাকওয়া-পরহেজগারী হইতে বঞ্চিত, তাহার মুখে নসীহত ও সদুপদেশ শুনিলে মানুষ হাসাহাসি করে। এমনকি এই ক্ষেত্রে বক্তার পক্ষ হইতে কোনরূপ জুলুমের আশংকা না থাকিলে তাহার সঙ্গে বেআদবীও করিয়া বসে।

মুহ্‌তাসিবের জন্য সচ্চরিত্রতা আবশ্যক হওয়ার কারণ হইল, অনেক সময় মুনকার ও গর্হিত কর্ম দেখিয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে এবং ক্ষেত্র বিশেষে এই ক্রোধের আগুন এমনই উত্তপ্ত হয় যে, শুধুমাত্র এলেম ও পরহেজগারী দ্বারা তাহা প্রশমন করা যায় না। বরং সচ্চরিত্রতার পানি দ্বারা তাহা নির্বাপন করিতে হয়। বস্তুতঃ সেই ব্যক্তিই যথার্থ পরহেজগার ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী, যে নিজের নফসকে পরিপূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

মোটকথা, আদেশ ও নিষেধকারীর মধ্যে যখন তিনটি গুণের সমাবেশ ঘটে, তখন তাহার এই আমল দ্বীনের জন্য নুসরত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপাদান হয়। পক্ষান্তরে মুহতাসিবের মধ্যে যখন এই সব গুণের অভাব থাকে, তখন ইহ্‌তিসাবের আমলে অসঙ্গত উপায়, অযৌক্তিক ডাঁট-ধমক, প্রহার ইত্যাদি কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং পরিণতিতে ইহ্‌তিসাবের মূল আমলটিই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবশেষে হয়ত আল্লাহর দ্বীন হইতে গাফেল হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণের ফিকিরে জড়াইয়া পড়ে। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ সুনাম-সুখ্যাতি ও মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যেই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের উপর আমল করিয়া থাকে। সুতরাং যখনই তাহারা দেখিতে পায় যে, তাহাদের সুনাম-সুখ্যাতি ক্ষুণ্ন হওয়ার কোন উপসর্গ দেখা দিয়াছে, তখনই আদেশ-নিষেধের আমল ত্যাগপূর্বক নিজের ফিকিরে লাগিয়া যায়।

উপরোক্ত তিনটি গুণের কারণে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ছাওয়াবের কাজে পরিণত হয় এবং অসৎ ও গর্হিত কর্ম দমনে এই তিনটি গুণ কার্যকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যেই ব্যক্তি এইসব গুণ হইতে বঞ্চিত, সেই ব্যক্তি অসৎ কর্ম দমনে বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করিতে পারে না। বরং ক্ষেত্র

বিশেষ শরীয়তের সীমা লংঘনের ফলে তাহার অসৎ কর্ম দমনের আমলটিই অসৎ কর্মে পরিণত হয়।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সেই ব্যক্তি করিবে যে আদেশ করার সময় নম্রতা অবলম্বন করে এবং নিষেধ করার সময়ও বিনম্র আচরণ প্রদর্শন করে। আদেশ করার সময় সহনশীল হয় এবং নিষেধ করার সময়ও সহনশীলতা অবলম্বন করে। আদেশ করার সময় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় এবং নিষেধ করার সময়ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়।

উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা ইহা জানা গেল যে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী ব্যক্তি মৌলিকভাবেই ফাহীম ও বুদ্ধিমান হওয়া জরুরী নহে। বরং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ও সমঝদার হওয়া জরুরী। নম্রতা ও সহনশীলতার ক্ষেত্রেও একই কথা। আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রেও বিনম্র ও সহনশীল হইতে হইবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এরশাদ করেন, তুমি সৎ কাজের আদেশদাতাদের দলভুক্ত হইতে চাহিলে তোমাকেও সৎ কাজের উপর সকলের অধিক আমল করিতে হইবে। কোন কবি বলেন–

لا تلم المرء على فعله + و أنت منسوب الى مثله

من ذم شيئا و اتى مثله + فانما يزري على عقله

অর্থাৎ– "তুমি অপরকে এমন কোন কাজের তিরস্কার করিও না, যাহা দ্বারা তোমাকেও অভিযুক্ত করা যায়। যেই ব্যক্তি কোন কাজের নিন্দা করে, অথচ সে নিজেও উহাতে লিপ্ত; তবে সে যেন নিজের নির্বুদ্ধিতার বিলাপ করে।"

অবশ্য আমরা এই কথা বলি না যে, যেই ব্যক্তি নিজে অসৎ কর্মে লিপ্ত, তাহার পক্ষে সৎ কাজের আদেশ নিষিদ্ধ হইয়া যায়। বরং আমাদের বক্তব্য হইল– সৎ কাজের আদেশদাতা নিজে সৎ কর্মশীল না হইলে মানুষের অন্তরে তাহার কথার তাছীর হয় না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সৎ কাজের আদেশের জন্য যাবতীয় অন্যায়-অপরাধ ও গোনাহ হইতে পবিত্র হওয়া জরুরী নহে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমরা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলাম–

يا رسول الله ! لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به و لا نهي عن المنكر حتى نجتنبه كله، نقال صلى الله عليه وسلم، بل مروا بالمعروف و ان لم تعملوا به و انهو عن المنكر دان لم تجتنبوه كله ۰ (طبراني صفير و اوسط)

অর্থঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি সৎ কাজের আদেশ করিব না, যেই পর্যন্ত নিজেরা সেই সৎ কাজের উপর আমল না করিব? এবং আমরা কি অসৎ কাজের নিষেধ করিব না, যেই পর্যন্ত নিজেরা সকল মন্দ কাজ হইতে বিরত না থাকিব? তিনি এরশাদ করিলেনঃ না, তোমরা বরং সৎ কাজের আদেশ কর, যদিও নিজেরা সকল সৎ কাজ করিতে না পার এবং অসৎ কাজের নিষেধ কর, যদিও নিজেরা সকল অসৎ কাজ হইতে বিরত না থাক।"

এক বুজুর্গ তাঁহার পুত্রগণকে ওসীয়ত করিয়া বলেন, তোমরা যখন সৎ কাজের আদেশ করার ইচ্ছা করিবে, তখন মনকে সবর ও ধৈর্য ধারণে অভ্যস্থ করিয়া লইবে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে উহার আজর ও বিনিময় লাভের দৃঢ় একীন পোষণ করিবে। যেই ব্যক্তি ছাওয়াব প্রাপ্তির একীনের সহিত কোন আমল করে, ঐ আমলের কারণে কোনরূপ নির্যাতন হইলেও তাহাতে সে কোনরূপ কষ্ট অনুভব করে না। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, আদেশ ও নিষেধের একটি আদব হইল, ধৈর্য ধারণ করা। এই কারণেই পবিত্র কোরআনে সৎ কাজের আদেশের পাশাপাশি ধৈর্য ধারণের কথা উল্লেখ হইয়াছে। যেমন সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে হযরত লোকমান আলাইহিস্ সালামের একটি উক্তি এইভাবে উল্লেখ হইয়াছে−

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ

অর্থঃ "হে বৎস! নামাজ কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ কর, মন্দ কাজের নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর।" (সূরা লোকমানঃ আয়াত ১৭)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের আরেকটি আদব হইল− পার্থিব সম্পর্ক কমাইয়া দেওয়া। ফলে এই কাজে কোনরূপ ভয় ও প্রতিবন্ধক থাকিবে না। অনুরূপভাবে কাহারো নিকট হইতে কিছু পাওয়ার আশা না করা। উহার ফলে মানুষকে তোষামোদ ও তোয়াজ করিয়া চলার প্রয়োজন হইবে না।

কথিত আছে যে, এক বুজুর্গ একটি বিড়াল পালিতেন। বিড়ালটির জন্য তিনি প্রতিদিন এক কসাইর দোকান হইতে গোশতের হাড়-পর্দা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। এক দিন বুজুর্গ সেই দোকানে গিয়া দেখিতে পাইলেন, কসাই একটি অন্যায় কাজ করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি বিড়ালের জন্য খাবার না লইয়াই বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর তিনি বিড়ালটিকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়া পুনরায় কসাইর দোকানে আসিয়া তাহাকে অন্যায় কাজ করিতে নিষেধ করিলেন। কসাই বুজুর্গের প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিল, আর কোন দিন আপনার বিড়ালের জন্য আমি খাবার দিব না। বুজুর্গ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, তাহাতে কি হইয়াছে? বিড়ালটিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবার

পরই আমি তোমাকে নিষেধ করিতে আসিয়াছি। এখন তোমার নিকট আমি কিছুই পাওয়ার আশা করি না।

বস্তুতঃ যেই ব্যক্তি মানুষের নিকট হইতে কিছু পাওয়ার আশা ত্যাগ করিতে পারিবে না, তাহার পক্ষে মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করা সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে যেই ব্যক্তি সকলের নিকট ভাল থাকিতে চাহে এবং এইরূপ কামনা করে যে, মানুষ যেন সর্বদা আমার প্রশংসা করে, সেই ব্যক্তির পক্ষেও মানুষকে অন্যায় কাজে বাঁধা দেওয়া সম্ভব হয় না।

হযরত কা'ব আহবার আবু মুসলিম খাওলানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কওমের মধ্যে আপনার মর্যাদা কেমন? জবাবে তিনি বলিলেন, কওমের লোকেরা আমাকে খুব ইজ্জত ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। হযরত কা'ব বলিলেন, তাওরাত কিতাবে কিন্তু এই বিষয়ে অন্য রকম লিখিত আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেখানে কি লিখিত আছে? হযরত কা'ব বলিলেন, তাওরাত কিতাবে লিখিত আছে, মানুষ যখন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, তখন কওমের লোকদের মধ্যে তাহার মর্যাদা হ্রাস পায় এবং লোকেরা তাহাকে খারাপ বলিতে থাকে। এইবার আবু মুসলিম খাওলানী বলিলেন, তাওরাত কিতাবের উক্তি যথার্থ এবং আবু মুসলিম অসত্য বলিয়াছে।

অন্যায়ের প্রতিরোধঃ নম্রতার সহিত

একবার জনৈক ওয়ায়েজ খলীফা মামুনকে কোন গর্হিত কাজ করিতে দেখিয়া কঠোর ভাষায় সদুপদেশ দিলে খলীফা মামুন তাহাকে বলিলেন, বড় মিয়া! একটু নরম ভাষায় কথা বলুন। দেখুন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম আপনার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন আর ফেরাউন আমার চাইতেও নিকৃষ্ট ছিল। অথচ আল্লাহ পাক এই ফেরাউনকে নসীহত করা প্রসঙ্গে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে নম্রতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়া বলিলেন−

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

অর্থঃ "অতঃপর তোমরা তাহাকে নম্র কথা বল, হয়ত সে চিন্তা-ভাবনা করিবে অথবা ভীত হইবে।" (সূরা তোয়াহাঃ আয়াত ৪)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীদের কর্তব্য, এই ক্ষেত্রে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের নীতি অনুসরণ করা। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা এক যুবক নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আয় আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে যিনা করার অনুমতি প্রদান করেন? যুবকের এই (অসঙ্গত) উক্তি শুনিয়া উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম উত্তেজিত হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু

আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট আন। অতঃপর সে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িল। এইবার তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা বল তো, তোমার মা যিনা করুক, ইহা কি তুমি পছন্দ করিবে? যুবক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলঃ আয় আল্লাহর রাসূল! আমার জীবন আপনার উপর উৎসর্গ হউক, আমি ইহা কখনো পছন্দ করিব না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মানুষের অবস্থা এইরূপই যে, তাহারা মায়ের যিনা সহ্য করিতে পারে না। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তোমার কন্যার জন্য যিনা পছন্দ করিবে? যুবক আরজ করিলঃ না, আয় আল্লাহর রাসূল! আমার জীবন আপনার উপর উৎসর্গ হউক। তিনি এরশাদ করিলেনঃ মানুষের অবস্থা এইরূপ যে, তাহারা নিজেদের কন্যার যিনা সহ্য করিতে পারে না। অতঃপর তিনি বোন এবং ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েত অনুযায়ী খালা ও ফুফু সম্পর্কেও এইরূপ প্রশ্ন করিলে প্রতিবারই সে জবাব দিল যে, আমার প্রাণ আপনার উপর উৎসর্গ হউক, আমি ইহা পছন্দ করিব না। অতঃপর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় দস্ত মোবারক যুবকের বক্ষে স্থাপনপূর্বক এইরূপ দোয়া করিলেন—

اللهم طهر قلبه و اغفر ذنبه و حصن فرجه

অর্থঃ "আয় আল্লাহ! তাহার অন্তর পরিষ্কার করিয়া দিন, তাহার গোনাহ ক্ষমা করুন এবং তাহার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করুন।"

বর্ণনাকারী হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, উপরোক্ত ঘটনার পর যুবকের নিকট যিনার মত এমন যঘন্য পাপ আর কিছু ছিল না। (আহমাদ)

এক ব্যক্তি হযরত ফোজায়েল ইবনে আয়াজের নিকট আসিয়া হযরত সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাহ সম্পর্কে অভিযোগ করিল যে, তিনি বাদশাহর দান গ্রহণ করেন, ইহা কেমন? হযরত ফোজায়েল বলিলেন, তিনি তো বাদশাহর নিকট হইতে কেবল নিজের প্রাপ্যই গ্রহণ করেন– ইহাতে তোমার এত আপত্তি কেন? পরে অভিযোগকারী চলিয়া গেলে তিনি হযরত সুফিয়ানকে একান্তে ডাকাইয়া তাম্বীহ করিলেন এবং বাদশাহর দান গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। হযরত সুফিয়ান বলিলেন, হে আবু আলী! যদিও আমি নিজে নেক নহি, কিন্তু নেককার ব্যক্তিগণকে আমি মোহাব্বত করি, (কেননা, আমি আপনার কথাকে খারাপ মনে করি না এবং আপনি যাহা নসীহত করেন তাহা নির্দ্বিধায় মানিয়া লই)।

হাম্মাদ ইবনে সালামা বর্ণনা করেন, একদা ছেলো ইবনে আশয়ামের নিকট এক ব্যক্তি আগমন করিল, তাহার পাজামা গিঁঠের নীচে ঝুলিতেছিল। উপস্থিত লোকেরা তাহাকে তিরস্কার করিতে চাহিলে তিনি সকলকে বাঁধা দিয়া বলিলেন, তোমরা তাহাকে কিছু বলিও না, তাহার জন্য আমিই যথেষ্ট। অতঃপর তিনি লোকটিকে নিকটে বসাইয়া নরম ভাষায় বলিলেন, ভাতিজা! তোমার সঙ্গে আমার একটি কথা আছে। লোকটি উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে আপনার কি কথা আছে বলুন। তিনি বলিলেন, আমার ইচ্ছা, তোমার পাজামাটি গিঁঠের একটু উপরে পরিধান কর, ইহাতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি? লোকটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল– "বেশ ভাল কথা, চাচাজান! ইহাতে আপত্তির কি থাকিতে পারে?" এই কথা বলিয়াই সে পাজামা গিঁঠের উপরে উঠাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। লোকটি চলিয়া যাওয়ার পর ছেলো ইবনে আশয়াম উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা যদি তাহার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করিতে, তবে জবাবে সেও হয়ত তোমাদের সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করিত এবং রাগের মাথায় বিরক্ত হইয়া তোমাদের নসীহত প্রত্যাখ্যান করিত।

মোহাম্মদ বিন জাকারিয়া গালাবী নিজের চোখে দেখা ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ একদিন মাগরিবের নামাজ আদায়ের পর মসজিদ হইতে বাহির হইয়া ঘরে ফিরিতেছিলেন। পথে তিনি দেখিতে পাইলেন, এক কোরাইশী যুবক মদ পানে মাতাল অবস্থায় এক নারীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর বিপন্ন নারীটি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া মানুষের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। তাহার চিৎকার শুনিয়া আশেপাশের লোকেরা ছুটিয়া আসিয়া যুবককে হাতেনাতে ধরিয়া ফেলিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ যুবকটিকে পূর্ব হইতেই চিনিতেন। তিনি আগাইয়া গিয়া লোকজনকে বলিলেন, আমার ভাতিজাকে ছাড়িয়া দাও। লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। পরে তিনি যুবককে নিকটে আহবান করিলে সে লজ্জায় অবনত মস্তকে তাহার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল। হযরত আব্দুল্লাহ তাহাকে সস্নেহে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, আমার সঙ্গে ঘরে চল। যুবক নীরবে তাহাকে অনুসরণ করিল। ঘরে আসিয়া তিনি খাদেমকে বলিলেন, ইহাকে তোমার সঙ্গে শোয়াইয়া রাখ এবং নেশা কাটিয়া যাওয়ার পর তাহাকে জানাইবে যে, সে মাতাল অবস্থায় কি কি কাণ্ড করিয়াছিল। আর আমার সঙ্গে দেখা না করিয়া তাহাকে যাইতে দিবে না।

নেশা কাটিয়া যাওয়ার পর খাদেমের নিকট ঘটনা শুনিয়া যুবক যারপর নাই লজ্জিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। পরে তাহাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদের নিকট হাজির করা হইলে তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বাপদাদার বংশে কালিমা লেপন করিয়া এমন কাণ্ড করিতে তোমার কি একটুও লজ্জা হইল না? তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ তুমি কেমন মানুষের ছেলে? তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং আজ হইতে তওবা কর– জীবনে আর কখনো এইরূপ কাজ করিবে না। যুবক লজ্জায় মাথা নত করিয়া চোখের পানি বর্ষণ

করিতেছিল। পরে সে অনুশোচনায় বিদগ্ধ হৃদয়ে আরজ করিল, চাচাজান! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জীবনে আর কখনো মদ ও নারী স্পর্শ করিব না। আমি আমার কৃতকর্মে অনুতপ্ত এবং এই অপরাধের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করিতেছি। আপনিও আমার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করুন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ যুবকের বক্তব্য শুনিয়া প্রীত হইলেন এবং স্বস্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, বহুত আচ্ছা বেটা, আল্লাহ পাক তোমার ভালাই করুন।

উক্ত যুবক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদের আদর-স্নেহ এবং তাঁহার আন্তরিক নসীহতে এমন প্রভাবিত হইল যে, অতঃপর সে আর কিছুতেই তাঁহাকে ত্যাগ করিল না এবং তাঁহার খেদমতে থাকিয়া হাদীছ শিক্ষা করিতে লাগিল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ বলেন, লোকেরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে বটে কিন্তু (কঠোরতা ও রূঢ় ব্যবহারের কারণে) তাহাদের "সৎ কাজের আদেশ" অসৎ কাজে পরিণত হয়। সুতরাং তোমরা সকল কাজে নম্রতা ও বিনম্র আচরণ অবলম্বন করিও। বিনয় ও বিনম্র আচরণ দ্বারাই তোমরা অতি সহজে ও উত্তমভাবে তোমাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবে।

ফাতাহ ইবনে শাখরাফ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি পথের উপর এক নারীকে জোরপূর্বক ধরিয়া তাহার শ্লীলতা হানীর চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময় অসহায় নারীটির চিৎকারে তথায় কতক লোক আসিয়া জড়ো হইল বটে, কিন্তু দুর্বৃত্তটি ছিল খুবই শক্তিশালী এবং তাহার হাতে ছিল একটি ছোরা। কেহ সামনে আগাইতে চাহিলেই সে ছোরা দিয়া তাহাকে আক্রমণ করিত। এই কারণে কেহই অসহায় নারীটিকে দুর্বৃত্তের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেছিল না।

ইত্যবসরে প্রখ্যাত সূফী হযরত বিশর ইবনে হারেস সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং আপন কাঁধ দ্বারা দুর্বৃত্তের কাঁধ স্পর্শ করিয়াই তথা হইতে চলিয়া গেলেন। হযরত বিশরের এই কাঁধ স্পর্শে এমন কি শক্তি ছিল তাহা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। এই সামান্য স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিধর লোকটি মাটিতে ছিটকাইয়া পড়িল এবং মহিলাটিও মুক্তি পাইয়া অক্ষত অবস্থায় তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত লোকজন একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। পরে তাহারা ভূতলশয়ী লোকটির নিকট আগাইয়া গিয়া দেখিল, সে প্রবল বেগে হাঁপাইতেছে এবং তাহার সমস্ত দেহ হইতে ক্রমাগত ঘাম বাহির হইতেছে। এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি হইয়াছে? লোকটি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জবাব দিল, আমি তো কিছুই বলিতে পারিব না। আমার কেবল এতটুকু মনে আছে, এক বৃদ্ধ আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ পাক তোমাকে এবং তোমার কর্ম দেখিতেছেন। এই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত দেহে প্রবল বেগে কম্পন শুরু হইয়া গেল এবং পদযুগল অবশ হইয়া আমি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলাম। আমি বলিতে পারিব না, সেই লোকটি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছিলেন। লোকেরা তাহাকে জানাইল, তিনি ছিলেন বিশর ইবনে হারেস। এই কথা শুনিয়া লোকটি চমকিয়া উঠিয়া বলিল, হায় আমার দুর্ভোগ! এখন তিনি আমাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখিবেন এবং আমার সম্পর্কে তিনি কি ধারণা পোষণ করিবেন? এই ঘটনায় সে ভয়ানক অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং সপ্তম দিবসে তাহার ইন্তেকাল হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন পর্যায়ে গর্হিত কর্ম

এই পর্যায়ে আমরা কতক মুনকার বা গর্হিত কর্ম এবং উহার হুকুম বর্ণনা করিব। অবশিষ্ট গর্হিত কর্মসমূহ বর্ণিত বিবরণের ভিত্তির উপর কেয়াস করিয়া লওয়া যাইবে। প্রকাশ থাকে যে, মুনকার বা গর্হিত কর্ম দুই প্রকার। মাকরূহ ও নিষিদ্ধ। মাকরূহ বিষয়ে নিষেধ করা মোস্তাহাব এবং উহাতে নীরব থাকা মাকরূহ; হারাম নহে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি তাহার কর্মটি মাকরূহ হওয়া বিষয়ে জ্ঞাত না থাকে, তবে এই বিষয়ে তাহাকে জানাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। নিষিদ্ধ বিষয়ে শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাঁধা না দেওয়া এবং নীরব থাকা হারাম। এই জাতীয় গর্হিত কর্ম মসজিদে, হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে এবং অপরাপর স্থানসমূহে পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে আমরা পৃথক শিরোনামে উহার উপর আলোচনা করিব।

মসজিদে গর্হিত কর্ম

প্রথম মুনকার

এক শ্রেণীর মানুষ মসজিদের ভিতরও বিবিধ মুনকার ও গর্হিত কর্মে লিপ্ত হয়। যেমন অনেকে নামাজের রুকু-সেজদাহ্গুলিতে বেশ তাড়াহুড়া করিয়া থাকে। অথচ নামাজে এইরূপ তাড়াহুড়া করা একটি গর্হিত কর্ম এবং উহার ফলে নামাজ নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং কাহাকেও এইরূপ করিতে দেখিলে তাহাকে নিষেধ করা ওয়াজিব। অবশ্য হানাফী মাজহাব মতে এই তাড়াহুড়ার কারণে নামাজ বাতিল হয় না।

দ্বিতীয় মুনকার

অনেকে কোরআন শরীফ ভুল তেলাওয়াত করিয়া থাকে। এইরূপ তেলাওয়াতে বাধা দেওয়া এবং সঠিক তেলাওয়াত শিক্ষা করিতে উদ্বুদ্ধ করা ওয়াজিব। যেই সকল ব্যক্তি মসজিদে এতেকাফের হালাতে ক্রমাগতভাবে জিকির-আজকার ও নফল এবাদতে মশগুল নহে; তাহাদের পক্ষে এই জাতীয় কর্মে বাধা দেওয়া উচিৎ। কেননা, এই আমলটি জিকির ও নফল এবাদত অপেক্ষা অধিক ফজিলতপূর্ণ। কারণ, নফল এবাদতের ফায়দা কেবল নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়। আর "অন্যায় ও গর্হিত কর্মে বাধা প্রদান" এর ফলে অপরাপর লোকেরা উপকৃত হয়। অর্থাৎ এই আমল দ্বারা নিজেরও ছাওয়াব হাসিল হয় এবং অপরাপর মানুষকেও ছাওয়াব হাসিলের পথ করিয়া দেওয়া হয়।

অন্যায় কর্মে বাধা প্রদানের ফলে যদি নিজের আয়-রোজগারের পথ বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, তবে এই ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে, তাহার নিকট কি পরিমাণ সম্পদ আছে। যদি দেখা যায়, জরুরত পরিমাণ সম্পদের ব্যবস্থা আছে, তবে গর্হিত কর্মে বাঁধা দেওয়া উচিৎ। কেননা, অতিরিক্ত রোজগারের আশায় "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" বর্জন করা জায়েজ নহে। তবে সেই ব্যক্তির নিকট যদি কেবল এক দিনের খোরাক মওজুদ থাকে, তবে তাহাকে অক্ষম ও মাজুর মনে করা হইবে এবং তাহার জিম্মা হইতে অন্যায়ের প্রতিরোধের দায়িত্ব রহিত হইয়া যাইবে।

কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতে যেই ব্যক্তি অতিরিক্ত ভুল করে, সেই ব্যক্তি যদি তাহার তেলাওয়াত শুদ্ধ করিতে সক্ষম হয়, তবে শুদ্ধ না করা পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হইতে বিরত থাকিবে। কেননা, আল্লাহর কালাম অশুদ্ধ তেলাওয়াত করিলে গোনাহগার হইবে। এমতাবস্থায় কেবল সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করিবে এবং উহা বিশুদ্ধভাবে শিক্ষা না করা পর্যন্ত অন্য সূরা পাঠ করিবে না। সূরা ফাতেহা শুদ্ধ হওয়ার পর অন্য সূরা মশক করিবে। অবশ্য জিহবার জড়তার কারণে যদি চেষ্টা করিবার পরও ভুল হইয়া যায়, তবে এই ক্ষেত্রে তাহাকে অপারগ মনে করা হইবে। যেই ব্যক্তি অধিকাংশ কোরআনই শুদ্ধভাবে পড়িতে পারে কিন্তু হঠাৎ হয়ত কোন কোন স্থানে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল হইয়া যায়– এইরূপ ভুলের জন্য কোন ক্ষতি হইবে না।

তৃতীয় মুনকার

আমভাবে প্রায় সকল মসজিদেই আজানের শব্দগুলি অকারণে লম্বা করিয়া টানা হয়। আবার অনেক মুয়াজ্জিন "হাইয়া আলাচ্ছালাহ্" ও "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলার সময় নিজের বক্ষ কেবলার দিক হইতে একেবারে ঘুরাইয়া ফেলে। এইসব বিষয় গর্হিত ও মাকরূহ। মুয়াজ্জিনকে এইসব বিষয় জানাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। যদি তাহারা জ্ঞাতসারে এইরূপ করে, তবে নিষেধ করা মোস্তাহাব।

চতুর্থ মুনকার

খতীবের পক্ষে এইরূপ কালো পোশাক পরিধান করা যাহাতে রেশমী সুতা অধিক কিংবা হাতে সোনালী তলোয়ার থাকা পাপ বিধায় নিষেধ করা ওয়াজিব। কিন্তু যেই পোশাক শুধুই কালো এবং যাহাতে কোন রেশমী সুতা নাই তাহা পরিধান করা মাকরূহ নহে। কিন্তু কালো রং এর পোশাক পছন্দনীয়ও বলা যাইবে না। কেননা, আল্লাহ পাকের নিকট সাদা পোশাকই অদিক পছন্দনীয়। কালো পোশাককে যাহারা মাকরূহ ও বেদআত বলিয়াছেন তাহাদের এই উক্তির ভিত্তি হইল– ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই জাতীয় পোশাক ব্যবহারে প্রচলন

ছিল না। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হইল, এই পোশাক ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেহেতু কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা আসে নাই, সুতরাং উহাকে "উত্তম নহে" বলা যাইতে পারে, কিন্তু মাকরূহ ও বেদআত বলা যাইবে না।

পঞ্চম মুনকার

যেই ওয়ায়েজ মিথ্যা কল্প-কাহিনী ও বেদআতপূর্ণ কথাবার্তা আলোচনা করে, সে ফাসেক। তাহাকে নিষেধ করা ওয়াজিব। বেদআতী ওয়ায়েজদের মাহ্ফিলে যোগদান করা উচিৎ নহে। অবশ্য বেদআতী ওয়ায়েজদের বক্তব্য খণ্ডন বা নিষেধ করার উদ্দেশ্যে যাওয়া যাইবে। যদি শক্তি থাকে তবে উপস্থিত সকল শ্রোতাকে কিংবা যেই পরিমাণ শ্রোতাকে সম্ভব হয় সেই ওয়াজ শুনিতে নিষেধ করিবে। মিথ্যাবাদী ওয়ায়েজগণের মিথ্যা ভাষণ খণ্ডন করিয়া প্রকৃত অবস্থা তুলিয়া ধরিবে। যদি এইরূপ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে এই ধরনের মাহ্ফিলে যাওয়া এবং বেদআতী ওয়াজ শোনার কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহ পাক তাঁহার নবীকে আদেশ করিয়া বলেন–

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

অর্থঃ "তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া যান, যেই পর্যন্ত তাহারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়।" (সূরা আনআমঃ আয়াত ৬৮)

এমন ওয়ায়েজের ওয়াজও মুনকার বা গর্হিত কর্মের অন্তর্ভুক্ত যাহা শুনিলে পাপকর্মে সাহসবৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ যেইসব ওয়াজে আল্লাহ পাকের রহমত, মাগফেরাত ও আশার বাণী খুব বেশী বর্ণনা করা হয়, তাহা শ্রবণ করিলে পাপের শাস্তি ও ভয়াবহতার অনুভূতি হ্রাস পাইয়া অন্তর হইতে আল্লাহর ভয় দূর হইয়া যায়। সুতরাং এইরূপ গর্হিত কর্মে বাধা দেওয়া ওয়াজিব। বর্তমান যুগে আশার বাণী অপেক্ষা ভয় ও আজাবের কথা অধিক বর্ণনা করা হিতকর। তবে এককভাবে রহমতের বাণী না শোনাইয়া পাশাপাশি আশা ও ভয়ের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে।

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) এরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন যদি এইরূপ ঘোষণা দেওয়া হয় যে, শুধু মাত্র একজন মানুষ ব্যতীত অন্য সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে, তবে আল্লাহর রহমতের উপর আমি এইরূপ আশাবাদী যে, জাহান্নাম হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত সেই একমাত্র ব্যক্তিটি হয়ত আমিই হইব। অনুরূপভাবে যদি এইরূপ ঘোষণা দেওয়া হয় যে, সমস্ত মানুষ জান্নাতে যাইবে এবং শুধু এক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে, তবে সেই ক্ষেত্রেও আমার অন্তরে এমন ভীতি বিরাজ করিবে যে, সেই একমাত্র জাহান্নামী ব্যক্তিটি আমিই হই কি-না।

ওয়ায়েজ বয়সে যুবা হওয়া, ওয়াজের মধ্যে এশক-মোহাব্বত ও ভালবাসার বয়াত বেশী বেশী পাঠ করা, অঙ্গ-ভঙ্গিমা করিয়া দর্শক শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, অপরূপ সাজ-গোজে নারীগণ মাহ্ফিলে অংশ গ্রহণ করা– এই সবও গর্হিত কর্মের মধ্যে গণ্য এবং ইহাতে বাধা দেওয়া ওয়াজিব। কারণ, এই ধরনের ওয়াজ মানুষের সংশোধনের পরিবর্তে বিপর্যয়ের কারণ হইয়া থাকে। ওয়ায়েজের ধরন-ধারণ, লেবাস-পোশাক ও সুন্নতের এত্তেবা' ইত্যাদি দেখিয়াই অনুমান করা যাইবে যে, তিনি কোন্ ধরনের ওয়ায়েজ এবং তাহার ওয়াজ দ্বারা মানুষের উপকার হইবে, না অপকার। যদি ফেৎনার আশংকা হয় তবে নারীগণকে নামাজের জন্য মসজিদে এবং ওয়াজ মাহফিলে আসিতে দেওয়া যাইবে না। সে মতে হযরত আয়েশা (রাঃ) এই বিষয়ে নারীগণকে বাধা দিলে কেহ উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নারীগণকে জামায়াতে শরীক হইতে নিষেধ করিতেন না, কিন্তু আপনি নিষেধ করিতেছেন কেন? জবাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ইহা জানিতে পারিতেন যে, তাহার পরে নারীগণ কি কি অবস্থা সৃষ্টি করিবে, তবে নিশ্চয়ই নিষেধ করিতেন।

(বোখারী, মুসলিম)

ষষ্ঠ মুনকার

জুমুআর দিন ঔষধ, খাবার, তাবিজ ইত্যাদি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে জমায়েত হওয়া। ভিক্ষুকগণ মুসল্লীদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে দাঁড়াইয়া কোরআন তেলাওয়াত ও কবিতা আবৃত্তি করা ইত্যাদি সবই গর্হিত কর্ম। তবে এই সবের মধ্যে কোন কোনটি মিথ্যা ও প্রতারণার কারণে হারাম। যেমন ঔষধ বিক্রেতাদের রোগ নিরাময়ের মিথ্যা আশ্বাস, জাদুকর ও তাবিজ কারকদের প্রতারণা ইত্যাদি। এইসব লোকেরা সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করিয়া তাহাদের নিকট পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে। এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় চাই তাহা মসজিদের ভিতরে হউক বা বাহিরে, সর্ব ক্ষেত্রে তাহা মুনকার। এই মুনকার হইতে বাধা দেওয়া ওয়াজিব। কোন কোন কর্ম যেমন কাপড় সেলাই করা, কিতাব ও খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা মসজিদের বাহিরে সাধারণভাবে মোবাহ এবং মসজিদের অভ্যন্তরে ওজরের কারণে হারাম। যেমন– নামাজীদের জায়গা সংকীর্ণ হইয়া যাওয়া বা এই ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কথাবার্তার আওয়াজের কারণে নামাজে বিঘ্ন ঘটা ইত্যাদি। আর এই ধরনের কোন অসুবিধা না হইলে তাহা জায়েজ বটে, কিন্তু এই জাতীয় কর্ম মসজিদে না করাই উত্তম। মোটকথা, মসজিদকে বাজারে পরিণত করা সর্বাবস্থায় হারাম এবং এইরূপ করিলে অবশ্যই বাধা দিতে হইবে।

কোন মোবাহ কর্ম যখন স্বল্প পরিমাণে করা হয় তখন তাহা মোবাহের পর্যায়েই থাকে বটে, কিন্তু এই মোবাহ কর্মই যখন বার বার ও ক্রমাগতভাবে করা হয় তখন তাহা গোনাহের কাজে পরিণত হয়। যেমন ছগীরা গোনাহ যখন বার বার করা হয় তখন তাহা কবীরা গোনাহে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে মসজিদের অভ্যন্তরেও কোন সাধারণ কর্ম স্বল্প পরিমাণে করার সুযোগে যদি তাহা অধিক পরিমাণে শুরু হওয়ার আশংকা হয়, তবে স্বল্প পরিমাণের সূচনাতেই উহাকে বাধা দিতে হইবে। তবে এই বাধা দেওয়ার দায়িত্ব শাসনকর্তা, শাসনকর্তার প্রতিনিধি বা মসজিদের মুতাওয়াল্লীর। কেননা, স্বল্প পরিমাণ ও অধিক পরিমাণের পার্থক্য করা এবং স্বল্প পরিমাণের সুযোগে অধিক পরিমাণ শুরু হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ধারণ– ইত্যাদি বিষয়গুলি ইজতিহাদের মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে হইবে। এই ইজতিহাদ সাধারণ মানুষের কাজ নহে।

সপ্তম মুনকার

পাগল, মাতাল ও বালকদের মসজিদে আসা গর্হিত কর্ম। বালকরা মসজিদে আসিয়া যদি ক্রীড়া-কৌতুক না করে, তবে তাহাদের প্রবেশে কোন ক্ষতি নাই। এই কথা ঠিক যে, বালকরা মসজিদে খেলা করিতে থাকিলে তাহা দেখিয়া নীরব থাকা হারাম নহে, কিন্তু মসজিদকে যদি নিয়মিত খেলার স্থানে পরিণত করা হয় এবং মসজিদে আসিয়া খেলা করা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হয়, তবে এই ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া ওয়াজিব। মসজিদে বালকদের খেলাধুলার ক্ষেত্রেও যদি তাহা স্বল্প মাত্রায় হয় তবে তাহা জায়েজ। আর বেশী মাত্রায় হইলে তাহা হারাম।

উন্মাদ ও পাগল যদি মসজিদে আসিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে, অশ্লীল কথা ও বকাবকি না করে, মসজিদকে নাপাক না করে এবং উলঙ্গ না হয়, তবে তাহাদিগকে মসজিদে প্রবেশে বাধা দেওয়া বা ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে না। নেশাখোরেরও এই হুকুম। অর্থাৎ অশ্লীল কথন ও বচনের আশংকা হইলে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া ওয়াজিব।

যদি বলা হয়, নেশাখোরকে প্রহার করিয়া মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিৎ যেন ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইয়া যায়, তবে আমরা বলিব, তাহাকে প্রহার ও মসজিদ হইতে বহিষ্কার না করিয়া বরং মসজিদের ভিতরেই বসাইয়া নসীহত কর যেন সে নেশা ও মাদক সেবন ত্যাগ করে। অবশ্য ইহা সেই ক্ষেত্রে, যখন নেশার কারণে সে মাতাল না হইবে এবং তাহার হুশ-জ্ঞান ঠিক থাকিবে।

কাহারো মুখ হইতে শরাবের গন্ধ আসিলেই এমন মনে করা যাইবে না যে, সে শরাব পান করিয়াছে। কেননা, এমনও হইতে পারে যে, সে শরাবের মজলিসে বসিয়া ছিল বা মুখে শরাব লইয়া তাহা পান না করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। অবশ্য তাহার চালচলন দ্বারা যদি শরাব পান করা প্রমাণিত হয়, যেমন– টলিতে টলিতে চলা বা এমন কোন আচরণ করা যাহা সুস্থ ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ করে না, অর্থাৎ স্পষ্টরূপে যদি জানা যায় যে, সে নেশা করিয়াছে, তবে এই অবস্থায় তাহাকে মসজিদে বা অন্য যেকোন স্থানেই পাওয়া যাইবে, কঠোরভাবে বাধা দিতে হইবে, যেন ভবিষ্যতের জন্য সে সতর্ক হয় এবং নেশার বাহ্যিক লক্ষণ জাহির করিয়া না বেড়ায়। কেননা, অন্যায় কর্ম প্রকাশ করাও অন্যায়। অন্যায় কর্ম বর্জন করা যেমন ওয়াজিব, তদ্রূপ কোন কারণে অন্যায়ে জড়াইয়া পড়িলেও সেই অন্যায় গোপন করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তি যদি তাহার অপরাধ গোপন করিয়া রাখে, তবে তাহা লইয়া ঘাটাঘাটি করা যাইবে না।

বাজারে গর্হিত কর্ম

হাটে-বাজারেও বিবিধ গর্হিত কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে আমরা উদাহরণসহ উহার কতক অবস্থা উল্লেখ করিব।

প্রথম মুনকার

পন্য বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত লাভ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা অন্যায় ও গর্হিত কর্ম। কোন বিক্রেতা যদি বলে, আমি এই পণ্যটি এত টাকায় ক্রয় করিয়া এত টাকা লাভে এই দরে বিক্রয় করিব, তবে এই ক্ষেত্রে যদি সে মিথ্যা বলিয়া থাকে, তবে সে ফাসেক। এখন কোন ব্যক্তির যদি এই বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা থাকে, তবে ক্রেতাকে মিথ্যা সম্পর্কে জানাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি দোকানদারের খাতিরে নীরব থাকে, তবে এই খেয়ানতে সে বিক্রেতার অংশীদার হইয়া গোনাহগার হইবে।

দ্বিতীয় মুনকার

পণ্যের দোষ গোপন করা, যেন ক্রেতা সেই দোষ জানার কারণে ফেরৎ না যায়। ইহা সুস্পষ্টভাবেই মুনকার ও গর্হিত কর্ম। এখন কোন ব্যক্তির যদি এই দোষ জানা থাকে, তবে ক্রেতাকে জানাইয়া দেওয়া তাহার কর্তব্য। জানাইয়া না দিলে উহার অর্থ হইবে– একজন মুসলমানের আর্থিক ক্ষতিতে যেন তাহারও সম্মতি আছে। ইহা হারাম।

তৃতীয় মুনকার

ওজন ও মাপে কম করা– ইহাও মুনকার। অনেক দোকানদার প্রচলিত ওজনের কম বাটখারা এবং প্রচলিত মাপ হইতে খাটো গজ রাখে। কোন ব্যক্তির যদি দোকানদারের এই প্রতারণার কথা জানা থাকে, তবে তাহার কর্তব্য– হয় নিজে এই অন্যায় দমনের উদ্যোগ গ্রহণ করা কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাহা দূর করার চেষ্টা করা।

চতুর্থ মুনকার

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অবৈধ শর্ত করা। ইহা সুস্পষ্ট রূপেই গর্হিত কর্ম এবং ইহাতে বাঁধা দেওয়া ওয়াজিব। কেননা, অবৈধ শর্তের ফলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হইয়া যায়। অনুরূপভাবে সুদের লেনদেনেও বাধা দেওয়া ওয়াজিব।

পঞ্চম মুনকার

ঈদ বা অন্য কোন পর্ব উপলক্ষে শিশুদের জন্য প্রাণীর ছবিযুক্ত খেলনা ক্রয় করিয়া দেওয়া জায়েজ নহে। এই জাতীয় সামগ্রী ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং উহার বিক্রয় নিষেধ করা উচিৎ। সোনা-রূপার বরতন, রেশমী ও রূপার জরির টুপি এবং পুরুষদের জন্য রেশমী পোশাকেরও একই হুকুম। ব্যবহৃত কাপড় ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া নূতন বলিয়া বিক্রয় করা জায়েজ নহে। অনুরূপভাবে ছিঁড়া কাপড় রিফু করিবার পর ক্রেতার নিকট সেই ত্রুটি গোপন করিয়া বিক্রয় করাও জায়েজ নহে।

মোটকথা, এমনসব বিক্রয় হারাম যাহাতে প্রতারণা করা হয়। এই জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় এমন ব্যাপক যে, উহার পরিসংখ্যান করা এক দুরূহ ব্যাপার। তবে নমুনা হিসাবে আমরা যেই কয়টি অবস্থা বর্ণনা করিলাম উহার উপর ভিত্তি করিয়া অপরাপর ক্ষেত্রে কেয়াস করিয়া লওয়া যাইবে।

রাস্তা সংক্রান্ত গর্হিত কর্ম

মানুষের পথ চলাচল সংক্রান্ত মুনকার ও গর্হিত কর্ম অসংখ্য। এখানে আমরা নমুনা হিসাবে উহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। ঘরের বাহিরে পথের উপর বসার জন্য উঁচু চত্বর নির্মাণ করা, পথের উপর ঘরের বারান্দা, গ্যালারী, ছাদ ইত্যাদি নির্মাণ করা, গাছ লাগানো, খুঁটি পুতিয়া রাখা মুনকার। অর্থাৎ– এইসবের ফলে যদি পথ সংকীর্ণ হইয়া যায় বা পথিকের পথ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তবে তাহা মুনকার ও গর্হিত কর্মের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য রাস্তা যদি খুব প্রশস্ত হয় এবং এইসব কর্মের ফলে পথিকের পথ চলাচলে কোন বিঘ্ন না ঘটে, তবে এই ক্ষেত্রে নিষেধ করা হইবে না।

অনুরূপভাবে রাস্তার উপর গরু-ছাগল এমনভাবে বাঁধা যাইবে না যাহাতে পথ সংকীর্ণ হয় এবং উহাদের বিষ্ঠা ও পেশাবের ছিটা পথিকের গায়ে লাগে। কেহ এইরূপ করিলে তাহাকে নিষেধ করা হইবে। সওয়ারীতে আরোহণ ও অবতরণের জন্য জরুরত পরিমাণ সময় সওয়ারীকে পথে দাঁড় করানো মুনকার বা গর্হিত কর্ম নহে। কেননা, মানুষের উপকার ও জরুরতের জন্যই রাস্তা নির্মাণ করা হয়। তো জরুরতের জন্য সওয়ারীকে পথে দাঁড় করানো ইহাও মানুষের একটি উপকার বটে। এই উপকার লাভের ক্ষেত্রে কাহাকেও বাধা দেওয়া যাইবে না। অবশ্য কেহ যদি রাস্তার কিছু অংশকে নিজের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লয়, তবে অবশ্যই তাহাকে বাধা দিতে হইবে।

মোটকথা, এইসব ক্ষেত্রে মানুষের জরুরতের প্রতি লক্ষ্য করা হইবে এবং সেই জরুরতটিও রাস্তার সহিত সংশ্লিষ্ট কি-না তাহা দেখিতে হইবে। মানুষের সকল জরুরতই এক রকম নহে। লোক চলাচলের পথ দ্বারা এমন কাঁটাযুক্ত বোঝা লইয়া যাওয়া যাইবে না যাহা দ্বারা পথিকের গায়ে আঁচড় লাগিতে পারে বা তাহার কাপড় ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। অবশ্য রাস্তা যদি খুব প্রশস্ত হয় এবং বোঝার কারনে মানুষের কোন কষ্ট না হয়, তবে কোন আপত্তি নাই। কেননা মানুষকে তো এই পথ দ্বারাই বোঝা বহন করিতে হইবে। তবে কাঁটার বোঝা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পথে ফেলিয়া রাখা যাইবে না। বরং উহা রাস্তায় নামাইয়া স্থানান্তর করিতে যেই পরিমাণ সময় লাগে, সেই পরিমাণ সময়ই রাস্তায় রাখা যাইবে। জীব-জানোয়ারের উপর উহার ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা চাপাইয়া দেওয়াও মুনকার এবং উহাতে বাধা দেওয়া ওয়াজিব।

অনুরূপভাবে কসাই'র দোকানের সামনে পশু জবাই করা এবং উহার রক্ত ও মল-মুত্র দ্বারা রাস্তা নোংরা করিয়া রাখা– ইহাও গর্হিত কর্ম এবং ইহাতে বাধা দেওয়া হইবে। ঘরের ময়লা-আবর্জনা, আম-কলা ও তরমুজের ছিলকা ইত্যাদি যদি পথের উপর ফেলিয়া রাখা হয় এবং পানি ফেলিয়া রাস্তা পিচ্ছিল করিয়া রাখা হয়, তবে এইসব কর্ম গর্হিত এবং উহাতে বাধা দেওয়া হইবে।

কোন বাড়ীর ফটকে যদি এমন কুকুর বসিয়া থাকে, যে পথিকগণকে কামড়ায় বা তাহাদের উপর আক্রমণ করে, তবে উহাকে বাধা দেওয়া সেই বাড়ীর মালিকের উপর ওয়াজিব। কিন্তু কুকুর যদি কাহাকেও কষ্ট না দেয় এবং শুধুই ময়লা ছড়ায়, আর সেই ময়লা এমন যাহা এড়াইয়া চলা সম্ভব– তবে উহাকে বাধা দেওয়া হইবে না। কুকুর যদি পথের উপর এমনভাবে বসিয়া থাকে যে, উহার ফলে পথিকের পথ চলাচলে সমস্যা হইতেছে, তবে কুকুরের মালিককে বলা হইবে যেন সে তাহার কুকুরকে বাড়ীতে বাঁধিয়া রাখে। এমন কি বাড়ীর মালিকও যদি পথিকের সমস্যা করিয়া রাস্তায় বসিয়া থাকে, তবে তাহাকেও নিষেধ করা হইবে।

মেহমানদারী সংক্রান্ত মুনকার

পুরুষ মেহমানদের বসিবার জন্য রেশমী চাদর বিছানো হারাম। অনুরূপভাবে সোনা-রূপার পাত্রে আগর-লোবান বা অন্য কোন খুশবু জ্বালানো, সোনা-রূপার পাত্রে গোলাবের পানি ছিটানো, অনুরূপ পাত্রে পানি পান করা ইত্যাদি সবই মুনকার। জীব-যন্তুর ছবি সম্বলিত পর্দা ঝুলানো হারাম। মেহমানদারীর মজলিসে গান-বাজনার আয়োজন করা মুনকার। সুতরাং ইহা নিষেধ করা হইবে।

অনেক সময় মেহমানদের আগমনের পর মহিলাগণ ছাদের উপর উঠিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া থাকে। অথচ মেহমানদের মধ্যে এমন নওজয়ানও থাকে যাহাদের পক্ষ হইতে ফেৎনার আশংকা বিদ্যমান। সুতরাং ইহা নিষিদ্ধ এবং ইহাতে বাধা দেওয়া ওয়াজিব। যেই ব্যক্তি এইসব গর্হিত কর্মে বাধা দিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে সেই মজলিসে বসা জায়েজ নহে। কম্বল, স্থাপিত আসন, তাকিয়া ও বিভিন্ন পাত্রে যেই নকশা ও দৃশ্য অঙ্কিত থাকে, ঐগুলি নাজায়েজ নহে। তবে কোন পাত্র যদি প্রাণীর আকৃতিতে বানানো হয়, যেমন গোলাবজল ছিটাইবার পাত্রটির শীর্ষভাগ হয়ত পাখীর মাথার আকৃতিতে বানানো হইল– তবে তাহা হারাম এবং এইসব পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। রূপার ক্ষুদ্র সুরমাদানী ব্যবহার করা যাইবে কিনা এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। হযরত আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) একবার রূপার সুরমাদানী দেখিয়া মজলিস হইতে উঠিয়া গিয়াছিলেন।

দাওয়াতের মজলিসের যঘন্য মুনকার সমূহের মধ্যে হইল– পরিবেশিত আহার হারাম হওয়া, সেই স্থানটি জবর দখলকৃত হওয়া ইত্যাদি। খাবার মজলিসে যদি কেহ শরাব পান করিতে থাকে, তবে তাহার নিকট বসিয়া খানা খাওয়া উচিত নহে। কেননা, যেই মজলিসে শরাব পান হইতে থাকে, সেই মজলিসে যাওয়া জায়েজ নহে।

এখানে যদিও সে নিজে শরাব পান করিতেছে না, কিন্তু ফাসেক যখন কোন গোনাহ করিতে থাকে, তখন তাহার নিকট বসা জায়েজ নহে। অবশ্য ইহাতে মতভেদ রহিয়াছে যে, ফাসেক গোনাহের কাজ শেষ করিবার পর তাহার নিকট বসা যাইবে কি-না।

দাওয়াতের মজলিসে যদি কেহ রেশমী পোশাক বা স্বর্ণের আংটি পরিয়া আসে তবে বিনা প্রয়োজনে তাহার নিকট বসা ঠিক নহে। কেননা, সে ফাসেক। কোন নাবালেগ ছেলে রেশমী পোশাক পরিয়া আসিলে কি করা হইবে, এই বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে সঠিক মত ইহাই যে, বালকটি যদি সমঝদার হয়, তবে তাহার পোশাক খুলিয়া ফেলিতে হইবে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

هذا حرامان على ذكور امتي

অর্থাৎ– "আমার উম্মতের পুরুষের জন্য এই দুইটি হারাম।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)

উপরের হুকুমটি আম ও ব্যাপক। এখানে বালেগের জন্য বিশেষভাবে কিছু বলা হয় নাই। বর্ণিত হুকুমে যদি বালেগগনকে উদ্দিষ্ট করা হইয়াছে বলিয়া মানিয়াও লওয়া হয়, তবুও ছোট বালকদিগকে রেশমী পোশাক পরিধান হইতে বাধা দেওয়া উচিৎ। যেমন নাবালেগ বালকদিগকে শরাব পান করা হইতে বাঁধা দেওয়া হয়। অথচ ছোট বালকদের উপর যেমন শরীয়তের কোন হুকুম কার্যকর নহে, তদ্রূপ কোন নিষিদ্ধ বিষয়ও তাহাদের উপর কার্যকর নহে। কিন্তু শরাব পান করা হইতে বাধা দেওয়ার কারণ ইহা নহে যে, তাহারা বালেগ; বরং উহার কারণ হইল, নাবালেগদের জন্য শরাব পান হারাম নহে বটে, কিন্তু এই সময় শরাব পানের সুযোগ দিলে তাহারা যদি উহায় অভ্যস্থ হইয়া পড়ে তবে বালেগ হওয়ার পর তাহাদের পক্ষে সেই অভ্যাস ত্যাগ করা কঠিন হইবে।

রেশমী পোশাকের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত অবস্থা বিদ্যমান। অর্থাৎ নাবালেগ অবস্থায় যদি তাহারা রেশমী পোশাকে অভ্যস্থ হইয়া পড়ে এবং উহার ব্যবহার শরীরের জন্য ভাল লাগিয়া যায়, তবে বালেগ হওয়ার পর সেই অভ্যাস ছাড়ানো সমস্যা হইবে। অবশ্য এমন কম বয়েসী শিশু, যে এখনো ভালমন্দ পার্থক্য করিতে পারে না তাহার কথা ভিন্ন। কেননা, কোন্ পোশাকটি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ এবং অভ্যাস কাহাকে বলে, এইসব বিষয়ে এখনো তাহার সমঝ পয়দা হয় নাই। তবে উপরে বর্ণিত হুকুমটি যেহেতু আম এবং উহাতে কোন শ্রেণীবিশেষকে উল্লেখ করা হয় নাই; সুতরাং এই ক্ষেত্রে এমন সম্ভাবনাও বিদ্যমান যে, নাবালেগদের জন্যও উহার হুকুম অভিন্ন হইবে– চাই তাহাদের মধ্যে ভালমন্দের জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক।

অনেক সময় বেদআতী আকীদার লোক নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করার উদ্দেশ্যে জেয়াফতের মজলিসে আসিয়া অংশ গ্রহণ করে এবং এই সুযোগে তাহারা সাধারণ মানুষকে গোমরাহ করার চেষ্টা চালায়। যদি কোন মজলিসে এইরূপ লোকের উপস্থিতি জানা যায় এবং ইহাও নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, লোকটি নীরব থাকিবে না এবং কৌশলে তাহার অপতৎপরতা চালাইবেই; তবে এমন মজলিসে অংশ গ্রহণ বর্জন করিতে হইবে। অবশ্য কোন আলামত দ্বারা যদি ইহা জানা যায় যে, লোকটি তাহার মতবাদ প্রচার করিবে না বা প্রচার করিলেও যদি নিজের মধ্যে তাহা গ্রহণে অস্বীকৃতির যোগ্যতা ও হিম্মত থাকে; তবে সেই ক্ষেত্রেও বেদআতীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করার শক্তি ও নিয়ত

থাকার শর্তে অংশ গ্রহণ করা যাইবে। অন্যথায় উহাতে অংশ গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না।

কোন কোন জেয়াফতে কৌতুকী ও কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনাকারী লোক আনাইয়া তামাশার আয়োজন করা হয়। এইসব কিচ্ছা-কাহিনীর মধ্যে যদি কোনরূপ অশ্লীলতা ও মিথ্যার সংমিশ্রণ থাকে, তবে তাহা গর্হিত কর্মের অন্তর্ভুক্ত হইবে। পক্ষান্তরে সেইসব কিচ্ছা-কাহিনী যদি শুধুই লোকহাসানোর উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয় এবং উহাতে কোনরূপ মিথ্যা ও অশ্লীলতা না থাকে, তবে তাহা শুনিতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও শর্ত হইল, এইসব কিচ্ছা-কাহিনীর আসর স্বল্প মাত্রায় হইতে হইবে।

এমনসব প্রকাশ্য মিথ্যা যাহা দ্বারা কাহাকেও প্রতারিত করা বা কাহারো উপর দোষারোপ করা উদ্দেশ্য না হয়– তাহা মুনকার ও গর্হিত কর্মের মধ্যে গণ্য হইবে না। যেমন কোন ব্যক্তি অপর কাহাকেও বলিল, "একশত বার তোমাকে নিষেধ করিলাম বা হাজার বার এই কথাটি বলিলাম"। অথচ এই উক্তিটি সত্য নহে এবং কস্মিনকালেও সে একশত বার বা হাজার বার বলে নাই। কিন্তু তবুও সকলের নিকট এই কথা বিদিত যে, এই ক্ষেত্রে বর্ণিত সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য নহে; বরং কথাটির উপর তাকীদ ও জোর দেওয়াই উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহা মিথ্যার মধ্যে গণ্য হইবে না।

খানাপিনায় অতিরিক্ত খরচ করাও গর্হিত কর্ম। এইরূপ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারীদের কর্তব্য– মেজবানকে অপব্যয় করিতে নিষেধ করা। দাওয়াতে অতিরিক্ত খানাপিনার আয়োজন করিলে উহাতে অপব্যয়ের পাশাপাশি আরেকটি অনিষ্ট হইল, সম্পদ বরবাদ করা। সম্পদ বরবাদের সংজ্ঞা হইল– কোন বস্তু বা সম্পদ কোনরূপ ফায়দা ব্যতীত সম্পূর্ণ অকারণে নষ্ট করিয়া দেওয়া। যেমন– কাপড় জ্বালাইয়া দেওয়া, ছিঁড়িয়া ফেলা, ঘর ধ্বসাইয়া দেওয়া বা অর্থ-কড়ি পানিতে ফেলিয়া দেওয়া ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে মাতমকারী ও গায়ককে বখশীশ দেওয়াও অর্থ বরবাদ করার মধ্যে গণ্য। কেননা, এইসব বিষয় শরীয়ত সম্মত নহে। সুতরাং এইসব কাজে সম্পদ ব্যয় করার অর্থ হইতেছে, যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিনা ফায়দায় নিজের অর্থ বরবাদ করিয়া দিল। অপব্যয়ের বিষয়টি আরো ব্যাপক। কেবল গর্হিত কাজে অর্থ ব্যয় করাই অপব্যয় নহে; বরং বৈধ কাজে অতিরিক্ত ব্যয় করিলেও উহাকে অপব্যয় বলা হইবে। মানুষের জরুরত পরিমাণের বিষয়টিও সকলের ক্ষেত্রে এক রকম নহে। মানুষের অবস্থা ভেদে উহাতে পার্থক্য হইয়া থাকে। সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে অপব্যয়ে বাধা দেওয়া ওয়াজিব। যেমন এক ব্যক্তি বালবাচ্চা লইয়া ঘর সংসার করে। সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল এই ব্যক্তির সর্বমোট পুঁজি

একশত দিনার। ইহা ব্যতীত তাহার নিকট আর কোন অর্থ নাই। ওলীমার আয়োজনে সে এই সমুদয় অর্থ ব্যয় করিয়া দিল। এখন ওলীমায় ব্যয় করা যদিও মোবাহ, কিন্তু এইরূপ স্বল্প আয়ের ব্যক্তির পক্ষে উহাতে একশত দিনার ব্যয় করা সুস্পষ্টভাবেই অপব্যয় এবং উহাতে নিষেধ করা ওয়াজিব। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ۔

অর্থঃ "একেবারে মুক্তহস্ত হইও না, তাহা হইলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হইয়া বসবাস করিবে।" (সূরা বনী ইসরাঈলঃ আয়াত ২৯)

উপরোক্ত আয়াতটি মদীনায় এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হইয়াছে, যেই ব্যক্তি তাহার যাবতীয় সম্পদ সৎ কাজে ব্যয় করিয়া দিয়াছিল। পরে যখন তাহার পরিবারের লোকেরা আবশ্যকীয় খরচের জন্য তাহার নিকট অর্থ চাহিল, তখন সে কিছুই দিতে পারিল না। অন্য আয়াতে আছে–

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا * اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ ۔

অর্থঃ "কিছুতেই অপব্যয় করিও না, নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" (সূরা বনী ইসরাঈলঃ আয়াত ২৬-২৭)

অপর এক আয়াতে আছে–

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۔

অর্থঃ "এবং তাহারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাহাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।" (সূরা ফোরকানঃ আয়াত ৬৭)

মোটকথা, অপব্যয় করা কোন অবস্থাতেই কাম্য নহে। কেহ এইরূপ করিলে তাহাকে বাধা দিতে হইবে। বরং এইরূপ অপব্যয় রোধ করা কাজীর উপর ওয়াজিব। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি সংসারে একা হয় এবং পরিবার পরিজন বলিতে তাহার কিছুই না থাকে তদুপরি অল্পেতুষ্টি ও তাওয়াক্কুলের শক্তিতে যদি শক্তিমান হয়, তবে তাহার পক্ষে নিজের সমস্ত সম্পদ সৎ কাজে ব্যয় করিয়া দেওয়া জায়েজ। ওলীমা অনুষ্ঠানের কথা এখানে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যথায় স্বল্প আয়ের ব্যক্তিদের পক্ষে নিজের সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া ঘরের দেয়ালে নকশা করাও জায়েজ নহে। তবে যাহাদের অগাধ ধন-সম্পদ আছে, তাহাদের পক্ষে জায়েজ। কেননা, সীমার ভিতর থাকিয়া শর্তসাপেক্ষে সাজ-সজ্জা করা নিষিদ্ধ নহে। সেই আদি কাল হইতেই মসজিদের ছাদ ও প্রাচীরে কারুকার্য করা হইতেছে। অথচ নিছক সৌন্দর্য বর্ধন ছাড়া উহার অন্য কোন উপকারিতা নাই। বাড়ী-ঘরেরও এই হুকুম। পোশাকের শোভা ও খাদ্যের

মান বর্ধনের ক্ষেত্রেও এইরূপ কেয়াস করিতে হইবে। স্বতন্ত্রভাবে ইহা মোবাহ কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে ইহার হুকুমে তারতম্য হইবে। অর্থাৎ বিত্তহীনের পক্ষে অপব্যয় এবং বিত্তবানের পক্ষে জায়েজ।

সাধারণ মুনকার

যাহারা অকর্মন্য অবস্থায় ঘরে বসিয়া থাকে, অর্থাৎ– মানুষকে দ্বীনের তালীম দেওয়া এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি কাজ হইতে গা বাঁচাইয়া চলে তাহারাও গর্হিত কর্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। গ্রাম ও বস্তি এলাকায় তো বটেই, বরং শহরের অধিকাংশ মানুষও নামাজের মাসায়েল হইতে অজ্ঞ। সুতরাং প্রতিটি মহল্লা ও শহরে এমন একজন বিজ্ঞ আলেম থাকা আবশ্যক– যিনি নিজের এলাকায় বসবাসকারী সকলকে দ্বীনের আবশ্যকীয় বিধান শিক্ষা দিবেন। অর্থাৎ যেই আলেম ফরজে আইন পালন করিবার পর ফরজে কেফায়ার উপর আমল করিতে সক্ষম, তাহার উচিৎ এলাকার জনসাধারণের নিকট গমনপূর্বক তাহাদিগকে দ্বীনের আবশ্যকীয় বিধান শিক্ষা দেওয়া। এই কাজে বাহির হওয়ার সময় নিজের পাথেয় সঙ্গে লইয়া যাইবে এবং সাধারণ মানুষের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করিবে না। কেননা, তাহাদের অধিকাংশ খাদ্য সন্দেহযুক্ত। কোন এলাকার একজন আলেমও যদি এই দায়িত্ব পালন করে তবে সেই এলাকার অপরাপর আলেমগণ এই দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে। অন্যথায় সকলেই অপরাধী হইবে।

আলেমগণ এই কারণে অপরাধী হইবে যে, তাহারা সাধারণ মানুষের নিকট দ্বীনের দাওয়াত লইয়া যায় নাই। আর সাধারণ মানুষ অপরাধী হওয়ার কারণ– তাহারা দ্বীনের আহ্‌কাম বিষয়ে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তাহা শিক্ষা করার চেষ্টা করে নাই। সাধারণ মানুষের মধ্যে যাহারা নামাজের মাসায়েল সম্পর্কে অবগত, তাহাদের কর্তব্য– অপরাপর মানুষকে তাহা শিক্ষা দেওয়া। অন্যথায় তাহারাও অজ্ঞ মানুষদের গোনাহের অংশীদার হইবে।

এই কথা সকলেরই জানা যে, কোন মানুষই মাতৃগর্ভ হইতে আলেম হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। সুতরাং যাহাদিগকে আল্লাহ পাক এলেম দান করিয়াছেন, সেই আলেমদের কর্তব্য দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে সাধারণ অজ্ঞ মানুষদের নিকট দ্বীনের বিধান পৌঁছাইয়া দেওয়া। আলেম হওয়ার জন্য ইহা জরুরী নহে যে, দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান ও সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে পারদর্শী হইতে হইবে। বরং যেই ব্যক্তি দ্বীনের একটি মাসআলা ও একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হইবে, তাহাকে সেই বিষয়ের আলেম মনে করা হইবে। অবশ্য ইহা অন্য কথা যে, আল্লাহ পাক যাহাদিগকে দ্বীনের তাবলীগ ও তালীমের যোগ্যতা দান করিয়াছেন, সেই আলেমগণ যদি তাহাদের দায়িত্ব পালন না করে, তবে সাধারণ অজ্ঞ

মানুষদের তুলনায় সেই আলেমদের শাস্তি অধিক হইবে। কেননা, সাধারণ মানুষের নিকট আল্লাহ পাকের বিধান পৌঁছাইয়া দেওয়া– ইহা আলেমগণেরই দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সম্পাদন তাহাদের পক্ষেই সম্ভব এবং ইহা তাহাদের পেশাও বটে। কোন কর্মকার যখন তাহার কর্ম ত্যাগ করিয়া অকর্মন্য অবস্থায় বসিয়া থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাহার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তো আলেমদের উপর দ্বীনের সেই মহান কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে– যাহার উপর মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত। আলেমগণের শান ও পেশা হইল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রাপ্ত দ্বীনের তা'লীম সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া। আর এই অর্থেই আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস এবং নবীগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত আমানতের হেফাজতকারী।

কোন মানুষের পক্ষে এই ওজরের কারণে ঘরে বসিয়া নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না যে, লোকেরা ভাল করিয়া নামাজ পড়ে না। বরং সাধারণ মানুষের নামাজের এই ত্রুটি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর তাহার কর্তব্য হইবে– ঘর হইতে বাহির হইয়া মানুষের নামাজের এছলাহ ও সংশোধনের ফিকিরে আত্মনিয়োগ করা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর ইহা ওয়াজিবও বটে।

বাজারের গর্হিত কর্মের ক্ষেত্রেও এই একই হুকুম। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি ইহা জানিতে পারে যে, অমুক বাজারে সর্বদা বা নির্দিষ্ট কোন সময়ে কোন গর্হিত কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, আর তাহার পক্ষে যদি ইহা দূর করার ক্ষমতাও থাকে, তবে এই ব্যক্তি ঘরে বসিয়া থাকা জায়েজ নহে। বরং বাজারে গিয়া সেই গর্হিত কর্মে বাধা দেওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। সেই গর্হিত কর্মটি যদি পুরাপুরি দূর করা সম্ভব না হয়, তবে যেই পরিমাণ সম্ভব সেই পরিমাণই করিতে হইবে। এই গর্হিত কর্ম দূর করিতে গিয়া যদি উহার কোন কোনটি দেখিতেও হয় তবুও পিছপা হইবে না। কেননা, যেই পরিমাণ দূর করা সম্ভব সেই পরিমাণ দূর করিতে গিয়া যদি অগত্যা অবশিষ্ট গর্হিত কর্মের উপর নজর পড়ে, তবে তাহাতে কোন পাপ হইবে না।

মোটকথা, প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য, মানুষের এছলাহ ও সংশোধনের ফিকির করা। এই এছলাহ ও সংশোধনের আমল শুরু করিবে প্রথমে নিজের উপর। নিজের ইছলাহ হইল– পাবন্দির সহিত শরীয়তের ফরজ হুকুম সমূহের উপর আমল করা এবং সর্ব প্রকার হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকা। নিজের সংশোধনের পর সর্ব প্রথম নিজের ঘরের লোকজনের সংশোধনের

ফিকির করিবে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে প্রতিবেশী, মহল্লাবাসী, শহরবাসী, শহরের আশপাশের লোকজন অতঃপর প্রত্যন্ত-পল্লীর লোকদের এছলাহের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। সবশেষে সমগ্র দুনিয়ার যেখানেই প্রয়োজন হইবে সেখানেই গমনপূর্বক মানুষের এছলাহ ও সংশোধনের দাওয়াত দিবে। নিকটে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি যদি এই দায়িত্ব পালন করে, তবে অনতিদূরে অবস্থানকারীর উপর হইতে এই ওয়াজিব রহিত হইয়া যাইবে। আর কেহই যদি এই দায়িত্ব পালন না করে, তবে নিকটে ও দূরে অবস্থানকারী এমন সকলকে জবাবদিহি করিতে হইবে যাহারা এই দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষও অজ্ঞ থাকিবে ততক্ষণ এই ওয়াজিব রহিত হইবে না। নিজে গমন করিয়া কিংবা অপর কাহাকেও পাঠাইয়া তাহার মাধ্যমেও এই দায়িত্ব পালন করা যাইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাদশাহ ও শাসক শ্রেণীকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা

ইতিপূর্বে আমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের কয়েকটি স্তর বর্ণনা করিয়াছি। যেমনঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার অন্যায় ও গর্হিত কর্ম সম্পর্কে অবহিত করা, ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে নিষেধ করা, কঠোর ভাষায় বারণ করা এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে বারণ করা বা প্রয়োজনে তিরস্কার ও প্রহার করা।

বাদশাহ্ ও শাসকবর্গকে উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মাধ্যমে নিষেধ করা জায়েজ। অর্থাৎ জ্ঞাত করা ও উপদেশ দেওয়া। প্রজাদের পক্ষে বল প্রয়োগের মাধ্যমে শাসক শ্রেণীকে নিষেধ করা জায়েজ নহে। কেননা, এইরূপ করিতে গেলে হিতে বিপরীত ও বিবিধ অনিষ্ট সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। অবশ্য তৃতীয় স্তর তথা কঠোর ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা জায়েজ এবং মোস্তাহাব। তবে শর্ত হইল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এই বিশ্বাস থাকিতে হইবে যে, আমার এই আমলের কারণে অপর কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। নিজের ক্ষতি হইলে উহার জন্য বিশেষ চিন্তিত হওয়ার কারণ নাই। আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত শাসক শ্রেণীকে আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার করিয়াছেন এবং এই ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিপদাপদকে কিছুমাত্র পরওয়া করেন নাই। কেননা, তাঁহারা এই কথা ভাল করিয়াই জানিতেন যে, আল্লাহ পাকের দ্বীনের তাবলীগ ও নুসরত করিতে গিয়া যদি জীবনও দিতে হয়, তবে তাহাতেও কোন আপত্তি নাই; কেননা, এইভাবে জীবন দিলে শাহাদাত নসীব হইবে। রাসুলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام الى امام فامره و نهاه في ذات الله تعالى فقتله ·

অর্থাৎ– "শ্রেষ্ঠ শহীদ হইলেন হামজা ইবনে আব্দুল মোত্তালিব। অতঃপর সেই ব্যক্তি, যে শাসনকর্তার সামনে দাঁড়াইয়া আল্লাহর ওয়াস্তে (সৎ কাজের) আদেশ ও (অসৎ কাজের) নিষেধ করে এবং উহার কারনে শাসক তাহাকে হত্যা করে।" (হাকিম)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ–

افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

অর্থাৎ– "শ্রেষ্ঠ জেহাদ হইল অত্যাচারী শাসকের সামনে দাঁড়াইয়া হক কথা বলা।" (আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজা)

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় ও সত্যের ব্যাপারে আপোষহীন ও অটল মনোভাবের কথা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন–

قرن من حديد لا تأخذه في الله لومة لائم ۰ و تركه قوله الحق ماله من صديد

অর্থাৎ– ওমর লোহার মত এমন কঠিন যে, আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকের তিরস্কার তাহার উপর ক্রিয়া করে নাই। সত্য কথন তাহাকে নির্বান্ধব করিয়া দিয়াছে। (তিরমিজী, তাবরানী)

ন্যায় ও সত্যের পথে অটল বুজুর্গগণ যখন এই কথা জানিতে পারিয়াছেন যে, সর্বোত্তম কথা হইল যাহা জালেম বাদশাহর সামনে অকপটে প্রকাশ করা হয় এবং জালেম বাদশাহ যদি এই সত্য কথার অপরাধে (?) মৃত্যুদণ্ডও দেয় তবে উহার ফলে শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা হাসিল হইবে; তখন তাঁহারা সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি ও প্রতিকুলতা উপেক্ষা করিয়া হক ও সত্য প্রকাশে ব্রতী হন। এই কাজে তাঁহারা অনুপম ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন এবং নিজেদের জান-মালের বিনিময়ে কেবল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও পারলৌকিক মুক্তি প্রত্যাশা করেন। আমাদের আকাবের ও বুজুর্গানেদ্বীন যেই নীতিতে বাদশাহ ও শাসক শ্রেণীকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিয়াছেন, বর্তমানেও সেই নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

নিম্নে আমরা উদাহরণ স্বরূপ এই জাতীয় কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিব। এইসব ঘটনা পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ নিজ নিজ যুগে জালেম ও গোমরাহ্ শাসকদিগকে কিভাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিয়াছেন।

কোরাইশদের অন্যায় কাজে হযরত আবু বকরের প্রতিবাদ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) নিজে অসহায় ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও কোরাইশদের অন্যায় ও নির্যাতনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। নিম্নে আমরা এইরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। এই ঘটনার বর্ণনাকারী হযরত ওরওয়া (রাঃ)।

তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর নিকট জানিতে চাহিলাম, মক্কায় অবস্থানকালে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রধান প্রতিপক্ষ কোরাইশ নেতৃবর্গ তাঁহার উপর যেই নির্যাতন চালাইয়াছে, উহার মধ্যে সর্বাধিক নিষ্ঠুর ঘটনা কোন্‌টি ছিল? তিনি বলিলেন, একদিন আমি দেখিতে পাইলাম, কোরাইশ নেতৃবৃন্ধ বাইতুল্লাহর হাতিমে জামায়েত হইয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করিতেছে। তাহারা বলিতেছিল, আমরা মোহাম্মাদের ব্যাপারে বহু সহ্য করিয়াছি। সে আমাদের জ্ঞানীদিগকে মূর্খ বলিয়াছে, আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে গালি দিয়াছে এবং আমাদের ধর্মকে ক্রটিযুক্ত বলিয়াছে। আমাদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করিয়াছে এবং আমাদের উপাস্যদের প্রতি কটুক্তি করিয়াছে। অথচ আমরা এহেন গুরুতর বিষয়ে সবর করিয়া আসিয়াছি। কোরাইশ নেতৃবর্গ এইসব আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় আগমন করিলেন এবং হজরে আসওয়াদ চুম্বন করিয়া বাইতুল্লাহর তাওয়াফ শুরু করিলেন। তাওয়াফের এক পর্যায়ে যখন হাতিমের নিকটে আসিলেন, তখন কোরাইশ দলপতিগণ এক যোগে তাঁহার উপর বিষোদ্‌গার করিতে শুরু করিল। আমি তাঁহার পবিত্র চেহারায় উহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু তিনি কোরাইশদের এই আচরণের কোন প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে তাওয়াফ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় চক্করেও যখন তিনি কোরাইশদের নিকটে আসিলেন তখন তাহারা আগের মতই আচরণ শুরু করিল। এইবারও তিনি নীরব রহিলেন। কিন্তু তৃতীয় বারও তাহারা অনুরূপ আচরণ করিলে তিনি বলিলেন, হে কোরাইশ নেতৃবর্গ! আমি তোমাদের নিকট মৃত্যুর পয়গাম লইয়া আসিয়াছি (অর্থাৎ– ইসলাম তোমাদের নিকট মৃত্যুর মতই অসহনীয়)। এই কথা শুনিবার পর তাহারা মস্তক অবনত করিয়া এমনভাবে নীরব হইয়া গেল যেন তাহাদের মাথার উপর পাখী বসিয়া আছে। মাত্র কয়েক মুহূর্ত পূর্বে যাহারা প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার কাজে তৎপর ছিল, এক্ষণে সেই কোরাইশরাই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিল, হে আবুল কাসেম! আপনি নিরাপদে প্রস্থান করুন। আল্লাহর কসম! আপনি মূর্খ নহেন।

পরদিন পুনরায় তাহারা হাতিমে জড়ো হইয়া আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করিতে লাগিল। এই সময় আমি তাহাদের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তাহাদের মধ্য হইতে একজন অপরজনকে বলিল, তোমাদের কি স্মরণ আছে, গতকাল তিনি আমাদিগকে কি

দিয়াছেন আর আমরা তাহাকে কি দিয়াছি? তিনি এমনসব কথা বলিয়াছেন যাহা আমাদের নিকট অপছন্দনীয়। উহার পরও আমরা তাহাকে নিরাপদে ছাড়িয়া দিয়াছি।

মোটকথা, তাহাদের মধ্যে এই ধরনের আলোচনা চলিতেছিল। এমন সময় বাইতুল্লাহর আঙ্গিনায় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এক যোগে লাফাইয়া উঠিয়া আল্লাহর নবীকে ঘিরিয়া ফেলিল। অতঃপর জনৈক কোরাইশ নেতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মুহাম্মদ! তুমি কি আমাদের দেবতাকে খারাপ বল এবং আমাদের ধর্মের নিন্দা কর? আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীর-শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেনঃ হাঁ, আমি এইরূপই বলি। এই জবাব শুনিয়া তাহারা আরো ক্ষেপিয়া উঠিল এবং এক ব্যক্তি তাঁহার গায়ের চাদর ধরিয়া হেঁচকা টান দিয়া তাঁহাকে হেঁচড়াইতে লাগিল। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) পিছনে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখিয়া তিনি হায় হায় করিয়া উঠিলেন এবং সহসা কোরাইশ সরদারগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে হতভাগার দল! তোমাদের বিনাশ হউক। তোমরা কি তাঁহাকে এই কারণে মারিয়া ফেলিবে যে, তিনি বলেন, আমার রব আল্লাহ? কোরাইশ সরদারগণ হযরত আবু বকরের মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, ইতিপূর্বে আর কখনো কোরাইশরা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতকষ্ট দিতে আমি দেখি নাই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের অপর এক রেওয়াতে উপরোক্ত ঘটনাটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে; একদিন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহর চত্তরে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় ওকবা ইবনে মুঈত তথায় আসিয়া তাঁহার কাঁধে হাত রাখিল। অতঃপর নিজের চাদরটি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গলায় জড়াইয়া তাঁহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিতে চাহিল। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) বাইতুল্লাহর আঙ্গিনায় আগমন করিলেন এবং এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া ওকবার কবল হইতে আল্লাহর নবীকে উদ্ধার করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন–

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ

অর্থাৎ– "তোমরা কি একজনকে এইজন্যে হত্যা করিবে যে, সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ। অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট হইতে স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছে।" (সূরা মোমিনঃ আয়াত ২৮)

হযরত আবু মুসলিম খাওলানীর ঘটনা

একবার হযরত আমীর মোয়াবিয়া কি কারণে মুসলমানদের ভাতা বন্ধ করিয়া দেন। এই ঘটনার পর একদিন তিনি খোৎবা দিতে শুরু করিলে হযরত আবু মুসলিম খাওলানী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে মোয়াবিয়া! যেই সমস্ত সম্পদ তুমি আটকাইয়া রাখিয়াছ, সেইগুলি না তোমার পরিশ্রমলব্ধ, না তোমার পিতা বা মাতার পরিশ্রম লব্ধ। খাওলানীর এই বক্তব্য শুনিয়া আমীর মোয়াবিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি মিম্বর হইতে নামিয়া আসিলেন এবং উপস্থিত সকলকে নিজ নিজ স্থানে বসিয়া থাকিতে বলিয়া অন্দর মহলে চলিয়া গেলেন। অল্প কিছুক্ষণ পর তিনি গোসল করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আবু মুসলিম আমাকে এমন কথা বলিয়াছে যে, উহার ফলে আমার মনে ভিষণ রাগ ধরিয়া যায়। আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ শুনিয়াছি–

الغضب من الشيطان و الشيطان خلق من النار ۔ و انما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليغتسل

অর্থাৎ– "ক্রোধ শয়তানের পক্ষ হইতে এবং শয়তান আগুন দ্বারা সৃজিত। আর আগুন পানি দ্বারা নির্বাপিত হয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কাহারো ক্রোধ হইলে সে যেন গোসল করিয়া লয়।"

এই কারণেই ক্রুদ্ধ হওয়ার পর আমি ভিতরে গিয়া গোসল করিয়া আসিয়াছি। এখন আমি আবু মুসলিমকে বলিতেছি, সে যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য। এই সম্পদ আমার শ্রমলব্ধ নহে এবং আমার পিতামাতার শ্রমলব্ধও নহে। সুতরাং তোমরা আসিয়া তোমাদের ভাতা লইয়া যাও।

জাব্বা ইবনে মুহসিনের প্রতিবাদ

জাব্বা ইবনে মুহসিন (রহঃ) বলেন, বসরায় আমাদের গভর্ণর ছিলেন হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)। তাঁহার নিয়ম ছিল, খোৎবা প্রদানের সূচনাতে তিনি হামদ ও ছানার পর হযরত ওমর (রাঃ)-এর জন্য দোয়া করিতেন। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তিনি ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের কথা স্মরণ করিতেন না। তাঁহার এই আচরণটি আমার নিকট ভাল লাগে নাই। সেমতে একদিন তিনি খোৎবা দিতে শুরু করিলে আমি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলাম, বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনি হযরত ওমর ফারূককে (রাঃ) হযরত আবু বকর ছিদ্দিকের (রাঃ) উপর প্রাধান্য দিতেছেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ছিলেন ছাহেবে রাসূল এবং মুসলমানদের প্রথম

খলীফা। অথচ খোৎবায় আপনি হযরত ওমরের (রাঃ) জন্য দোয়া করেন কিন্তু হযরত আবু বকর ছিদ্দিকের কথা স্মরণ করেন না।

কয়েক জুমুআ পর্যন্ত তিনি এইরূপই করিলেন। পরে আমীরুল মোমেনীন খলীফা হযরত ওমরের (রাঃ) নিকট আমার নামে অভিযোগ লিখিয়া পাঠাইলেন যে, জাব্বা ইবনে মুহসিন আমার খোৎবায় বাধা সৃষ্টি করিতেছে। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে খলীফা হুকুম পাঠাইলেন, "জাব্বাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।"

খলীফার নির্দেশ পাইয়া আমি বসরা হইতে রওনা হইয়া মদীনায় পৌঁছাইলাম। এই সময় আমীরুল মোমেনীন গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি দরজায় আওয়াজ দিলে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আমি জাব্বা ইবনে মুহসিন, বসরা হইতে আসিতেছি। তিনি বলিলেন, তুমি তো 'মারহাবা' কিংবা 'আহলান' (অর্থাৎ– এমন বাক্য যাহা পরস্পর সাক্ষাতের সময় বলা হয়) ইত্যাদি কিছুই বলিলে না। আমি বলিলাম, মারহাবা হইল আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে। আর আহলান হইল পরিবার পরিজন। কিন্তু আমি তো একা। আমার পরিবার-পরিজন বা ধন-সম্পদ বলিতে কিছুই নাই। এখন আপনি বলুন, কি কারণে আমাকে এত দূর হইতে ডাকাইয়া আনিয়াছেন এবং কোন্ কারণেই বা আমাকে এই শাস্তি দেওয়া হইল। জবাবে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, আবু মূসা আশআরীর ও তোমার মাঝে বিরোধের কারণটা কি? আমি উহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলাম, হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) খোৎবায় আল্লাহ পাকের হামদ ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠের পর আপনার জন্য দোয়া করেন। এই বিষয়টি আমার নিকট দৃষ্টিকটু মনে হইয়াছে যে, তিনি আপনাকে হযরত আবু বকর ছিদ্দিকের উপর প্রাধান্য দিতেছেন। এই বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করাতেই তিনি আপনার নিকট আমার নামে অভিযোগ করিয়াছেন। আমার এই বক্তব্য শুনিয়া হযরত ওমর ফারূক অঝোর ধারায় কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর অশ্রু সংবরণ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি আমার তুলনায় অধিক তওফীক প্রাপ্ত ও হেদায়েত প্রাপ্ত। আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমি সঙ্গে সঙ্গে আরজ করিলাম, হে আমীরুল মোমেনীন! আমি আপনাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর একটি রাত ও একটি দিন ওমর ও ওমরের গোটা বংশধর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি কি তোমার নিকট উহার কারণ বর্ণনা করিব? আমি সম্মত হইলে তিনি বলিলেন–

হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর যেই রাতটি শ্রেষ্ঠ তাহা হইল–

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাফেরদের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে রাতের আঁধারে মক্কা নগরী ত্যাগ করিয়া মদীনার পথে রওয়ানা হন, তখন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) তাহার সঙ্গে ছিলেন। পথিমধ্যে কখনো তিনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগ্রে, কখনো পশ্চাতে আবার কখনো ডানে ও বামে চলিতেছিলেন। তাঁহার এই অস্থিরতা দেখিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু বকর! তুমি এমন করিতেছ কেন? তিনি আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার যখন আশংকা হয় যে, শত্রু হয়ত আপনার সম্মুখ দিকে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, তখন আমি আপনার অগ্রে চলিয়া আসি। আবার যখন আশংকা হয়, কেহ হয়ত আপনাকে ধাওয়া করিয়া আসিতেছে, তখন আমি আপনার পিছনে চলিয়া যাই। ডান দিক ও বাম দিক হইতে আক্রমণের আশংকার ক্ষেত্রেও সেই দিকে চলিয়া যাই। মোটকথা, আপনার নিরাপত্তার আশংকায় আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না।

শত্রুপক্ষ যেন তাঁহাদের উপস্থিতি টের না পায় এই উদ্দেশ্যে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ের অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া অতি সন্তর্পণে পথ চলিতেছিলেন। ফলে তাঁহার আঙ্গুল মোবারক যখম হইয়া যায়। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) এই অবস্থা দেখিয়া পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আর হাঁটিতে দিলেন না এবং তাঁহাকে নিজের কাঁধে তুলিয়া সওর পাহাড়ের একটি গুহার নিকট লইয়া গেলেন। এখানে আসিয়া তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই মহান জাতের কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি এই গুহার অভ্যন্তরভাগ দেখিয়া আসার পূর্বে আপনি ইহাতে প্রবেশ করিবেন না। কেননা, গুহার ভিতর যদি কোন কষ্টদায়ক প্রাণী থাকে তবে উহা দ্বারা যেন আমিই কষ্ট পাই এবং আপনি নিরাপদ থাকেন। অতঃপর তিনি গুহার ভিতর প্রবেশ করিলেন। যখন তিনি নিশ্চিত হইলেন যে, গুহার ভিতর কোন ক্ষতিকর প্রাণী নাই, তখন তিনি প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভিতরে লইয়া আসিলেন। পরে হযরত আবু বকর (রাঃ) গুহার এক স্থানে একটি গর্ত দেখিতে পাইলেন। তিনি আশংকা করিলেন, হয়ত উহা হইতে কোন সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি বাহির হইয়া আল্লাহর নবীকে কষ্ট দিতে পারে। অতঃপর তিনি নিজের পা দ্বারা সেই গর্তটির মুখ চাপা দিয়া রাখিলেন। কিছুক্ষণ পর গর্তের ভিতর হইতে একটি সাপ হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পায়ে দংশন করিল। বিষের তীব্র যন্ত্রণায় এক পর্যায়ে তাঁহার চোখ হইতে পানি বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু তবুও তিনি গর্তের মুখ হইতে পা সরাইলেন না। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-কে কাঁদিতে দেখিয়া বলিলেন, হে আবু বকর! لا تحزن ان الله معنا চিন্তা

করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ পাক হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অন্তরে সকুন ও সান্ত্বনা নাজিল করিলেন এবং অবশিষ্ট রাত তাঁহারা নির্বিঘ্নে অতিবাহিত করিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, এই হইল হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠ রজনীর ঘটনা। এক্ষণে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দিবসের ঘটনা শোন–

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আরবের কোন কোন সম্প্রদায় মোরতাদ হইয়া গেল। আবার কেহ কেহ ঘোষণা দিল– আমরা নামাজ পড়িব বটে, কিন্তু জাকাত আদায় করিব না। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আমি এমন নাজুক পরিস্থিতিতে জেহাদ করার পক্ষে ছিলাম না। সুতরাং পরিস্থিতির প্রতিকুলতার কারণে তাঁহাকে জেহাদ হইতে নিবৃত্ত করার জন্য আমি তাঁহার খেদমতে গিয়া আরজ করিলাম, আয় নায়েবে রাসূল! আপনি বরং মানুষের নিকট গিয়া নরমভাবে তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করুন। আমার বক্তব্য শুনিয়া তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, ওমর! আমাকে তুমি অবাক করিলে বটে। ইসলামের পূর্বে তুমি তো বেশ মজবুত ছিলে। আর ইসলামে আসিয়া তুমি এমন নরম হইয়া গেলে? আমি তাহাদের নিকট কি কারণে যাইব বল ? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সান্নিধ্যে চলিয়া গিয়াছেন। ওহীর আগমন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আল্লাহর কসম! তাহারা যদি আমাকে এমন একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে– যাহা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিত, তবে আমি তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব।

যাহাই হউক, পরে আমরা তাহার সঙ্গে থাকিয়া বিদ্রোহী দলসমূহের বিরুদ্ধে জেহাদ করিলাম। এখন আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, সেই দিন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত সঠিক ও সময়পোযোগী ছিল। অতঃপর হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরীকে তিরস্কার করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।

হযরত আতা ইবনে রূবাহ কর্তৃক খলীফাকে নসীহত

আসমায়ী বলেন, খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান নিজের শাসনামলে একবার হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। সেই সময় এক দিন তাহার দরবারে মক্কা ও মক্কার আশপাশের গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত আতা ইবনে রূবাহ খলীফার দরবারে আগমন করেন। খলীফা সম্মানে দাঁড়াইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং নিজের একান্ত নিকটে তাহাকে আসন গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। হযরত আতা আসন গ্রহণ করিবার পর খলীফা অত্যন্ত আদবের সহিত তাহার

সম্মুখে বসিয়া আরজ করিলেন, হে আবু মোহাম্মদ! আপনি কি উদ্দেশ্যে তাশরীফ আনিয়াছেন? হযরত আতা বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি আল্লাহ পাকের হেরেম ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেরেমের ব্যাপারে সর্বদা আল্লাহকে ভয় করুন। হারামাঈনের অধিবাসীদের খোঁজ-খবর রাখুন এবং মুহাজির ও আনসারদের বংশধরদের ব্যাপারেও আল্লাহকে ভয় করুন। কেননা, তাহাদের কারণেই আপনি খেলাফতের মসনদে আসীন হইতে পারিয়াছেন। যেই সকল মুজাহিদ সীমান্ত প্রহরা ও মুসলমানদের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত, তাহাদের ব্যাপারেও আল্লাহকে ভয় করিতে ভুলিবেন না। সাধারণ মুসলমানদের নাগরিক সুবিধা এবং তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতি নজর রাখিবেন। কেননা, তাহাদের ব্যাপারে বিশেষভাবে আপনাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। সাক্ষাতপ্রার্থীদের জন্য কখনো আপনার মহলের দরজা বন্ধ করিবেন না এবং তাহাদিগকে অবহেলা করিবেন না।

হযরত আতা ইবনে রূবাহ'র উপরোক্ত নসীহতের পর খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান আরজ করিলেন, আপনার নসীহত উত্তম ও যথার্থ। আমি আপনার কথামতই কাজ করিব। অতঃপর হযরত আতা প্রস্থানোদ্যত হইলে খলীফা তাহার খেদমতে আরজ করিলেন, হে আবু মোহাম্মদ! এতক্ষণ তো আপনি কেবল মানুষের কথা বলিলেন, এইবার আপনার নিজের কথা এবং নিজের কিছু প্রয়োজনের কথা বলুন। হযরত আতা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, মানুষের নিকট আমার কোন প্রয়োজন নাই– এই কথা বলিয়াই তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাওয়ার পর খলীফা মন্তব্য করিলেন, ইহারই নাম মহত্ত্ব ও বুজুর্গী।

হযরত আতার আরেকটি ঘটনা

কথিত আছে যে, একবার খলীফা ওলীদ ইবনে মালেক তাহার দারোয়ানকে বলিলেন, তুমি প্রধান ফটকে দাঁড়াইয়া থাক। এই পথে কেহ গেলে তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে, আমি তাহার নিকট হইতে গল্প শুনিব। দারোয়ান খলীফার নির্দেশমত ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সেই পথে হযরত আতা ইবনে রূবাহ কোথায় যাইতেছিলেন। দারোয়ান তাহার পথ রোধ করিয়া বলিল, বড় মিয়া! আপনি আমীরুল মোমেনীনের নিকট চলুন, ইহা তাহার নির্দেশ। হযরত আতা নির্বিবাদে দারোয়ানের সঙ্গে গিয়া খলীফার মহলে হাজির হইলেন। সেখানে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজও উপস্থিত ছিলেন। হযরত আতা খলীফা ওলীদ ইবনে মালেককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আচ্ছালামু আলাইকুম হে ওলীদ! ছালামের জবাব দানের পর খলীফা দারোয়ানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, হতভাগা! আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম এমন একজন

মানুষকে আনিয়া হাজির করিতে, যে আমাকে কিস্‌সা-কাহিনী শোনাইবে। আর তুমি কিনা এমন একজনকে নিয়া আসিয়াছ, যিনি আমাকে সেই নামে ডাকাও পছন্দ করেন না, যাহা আল্লাহ পাক আমার জন্য মনোনীত করিয়াছেন। (অর্থাৎ "আমীরুল মোমেনীন")। দারোয়ান আরজ করিল, এই ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ তো সেই পথে আসে নাই। অতঃপর খলীফা হযরত আতার খেদমতে আরজ করিলেন, আপনি আসন গ্রহণ করুন এবং আমাকে কিছু কথা শোনাইয়া যান। হযরত আতা সংক্ষেপে একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করিয়া বলিলেন, জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম হাবহাব। আল্লাহ পাক উহা এমন শাসনকর্তাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন যাহারা নিজ প্রজাদের উপর জুলুম করে।

এই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে খলীফা ওলীদ ভয়ানক চিৎকার দিয়া জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ হযরত আতাকে বলিলেন, আপনি খলীফাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। হযরত আতা তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, হে ওমর! প্রকৃত অবস্থা এইরূপই, প্রকৃত অবস্থা এইরূপই।

মালেক ইবনে মারওয়ানকে নসীহত

ইবনে আবী শোমায়লা ছিলেন একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাহিত্যিক। একবার তিনি খলীফা মালেক ইবনে মারওয়ানের নিকট গেলে খলীফা তাহাকে কিছু বলার অনুরোধ করিলেন। শোমায়লা বলিলেন, আমি কি বলিব! আপনি তো জানেন যে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ব্যতীত আর যাহা কিছুই বলা হইবে উহাই বক্তার জন্য অকল্যাণ ডাকিয়া আনিবে এবং এই কারণে তাহাকে জবাবদিহিও করিতে হইবে।

এই কথা শুনিয়া খলীফা কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, মানুষ তো সর্দাসর্বদা একে অপরকে নসীহত করিয়া আসিতেছে (সুতরাং আপনিও আমাকে নসীহত করুন)।

এইবার শোমায়েল বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আমার একটি কথা স্মরণ রাখিবেন, কেয়ামতের অশান্তি ও তিক্ততা হইতে এমন লোকেরাই মুক্তি পাইবে, যাহারা নিজের নফসকে অসন্তুষ্ট করিয়া আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিয়াছে। খলীফা আব্দুল মালেক পূর্বাধিক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, আপনার এই মূল্যবান নসীহত আমার সারা জীবন স্মরণ থাকিবে।

হাজ্জাজের সম্মুখে

ইবনে আয়েশা বলেন, একবার হাজ্জাজ বসরা ও কুফা নগরীর আলেম ও ফকীহগণকে ডাকাইলে আমরা সকলে গিয়া তাহার দরবারে হাজির হইলাম। হযরত হাসান বসরী সকলের পরে আগমন করিলেন। হাজ্জাজ অত্যন্ত ইজ্জতের

সহিত তাহাকে নিকটে বসাইলেন। অতঃপর আলোচনা শুরু হইল। আমরা হাজ্জাজের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে লাগিলাম। এক পর্যায়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রসঙ্গ উঠিলে হাজ্জাজ তাঁহার শানে অকথ্য ভাষায় কটুক্তি করিতে লাগিল। আমরা তখন হাজ্জাজের ভয়ে ভীত ছিলাম এবং হাজ্জাজের কথায় সায় দেওয়া ছাড়া আমাদের কোন উপায় ছিল না। এদিকে হযরত হাসান বসরী তখন নীরবে বসা ছিলেন। হাজ্জাজ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হে আবু সাঈদ! আপনি নীরবে বসিয়া আছেন কেন? আপনিও কিছু বলুন। হযরত হাসান প্রথমে কিছু বলিতে চাহিলেন না। কিন্তু হাজ্জাজ পুনরায় তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল, আপনি আলী সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। এইবার হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহ পাকের এই এরশাদ শুনিয়াছি–

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ط وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ط وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ *

অর্থঃ "আপনি যেই কেবলার উপর ছিলেন, উহাকে আমি এই জন্য কেবলা করিয়াছিলাম, যাহাতে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রাসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই ইহা কঠোরতর বিষয়। কিন্তু তাহাদের জন্য নহে যাহাদিগকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আল্লাহ এমন নহেন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করিয়া দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুণাময়।" (সূরা আলবাকারাঃ আয়াত ১৪৩)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলিলেন, হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে আমার সুস্পষ্ট মতামত হইলঃ তিনি এমন ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য যাহাদিগকে আল্লাহ পাক হেদায়েতের নূর দান করিয়াছেন। তদুপরি তিনি ছিলেন একাধারে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই এবং তাঁহার জামাতা। তিনি পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁহার যেই সব ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, উহার সকল কিছুই তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন তোমার পক্ষে কিংবা অপর কাহারো পক্ষে ইহা সম্ভব নহে যে, তাঁহার সেইসব শ্রেষ্ঠত্ব ও বুজুর্গী মুছিয়া ফেলিবে কিংবা তাঁহার ও সেইসবের মাঝে অন্তরায় হইবে। হযরত আলী (রাঃ) যদি কোন অন্যায় করিয়াও থাকেন, তবে আল্লাহ পাকই উহার হিসাব লইবেন– আমরা এই বিষয়ে নাক গলাইবার কে?

হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে হাসান বসরীর উপরোক্ত মতামত শুনিয়া হাজ্জাজ রোষানলে জ্বলিয়া উঠিল এবং অতিরিক্ত ক্রোধের কারণে সিংহাসন

হইতে নামিয়া শাহী মহলের একটি কক্ষে চলিয়া গেল। এই সময় আমরা তথা হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

এদিকে আমের শা'বী বলেন, হাজ্জাজ ভিতরে চলিয়া যাওয়ার পর আমি হযরত হাসান বসরীর হাত ধরিয়া বলিলাম, আপনি তো হাজ্জাজকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছেন এবং তাহার অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছেন। জবাবে তিনি আমাকে বলিলেন, হে আমের! তুমি আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাও। মানুষ বলে, আমের শা'বী কুফার একজন বড় আলেম। কিন্তু আমি বলি, এলেমের সঙ্গে তোমার দূরতম কোন সম্পর্কও নাই। তুমি একজন মানবরূপী শয়তানের সঙ্গে তাহার মর্জি অনুযায়ী কথা বল এবং তাহার মতামতে সায় প্রদান কর। ইহা খুবই যঘন্য কাজ। তুমি আল্লাহর ভয়কে উপেক্ষা করিয়া হাজ্জাজের প্রত্যাশা অনুযায়ী তাহার প্রশ্নের জবাব দিয়াছ। তাহার প্রশ্নের জবাবে সত্য প্রকাশের হিম্মত না থাকিলে তুমি নীরব থাকিতে পারিতে। আমের শা'বী বলিলেন, আমি যদিও হাজ্জাজের অনুকূলে জবাব দিয়াছি, কিন্তু আমার অপরাধ সম্পর্কে বরাবরই আমার অনুভূতি ছিল। হযরত হাসান বলিলেন, ইহা তো আরো যঘন্য অপরাধ যে, তুমি জানিয়া-শুনিয়া মিথ্যা বলিতেছিলে।

আমের শা'বী বলেন, হাজ্জাজ অতঃপর হযরত হাসান বসরীকে সম্মুখে ডাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, যেই সমস্ত শাসক ধন-সম্পদের জন্য আল্লাহর বান্দাদেরকে হত্যা করে, আপনি কি তাহাদের ধ্বংসের জন্য দোয়া করেন এবং জনসম্মুখে তাহাদের নিন্দাও করেন? তিনি বলিলেনঃ হাঁ, আমি এইরূপই করি বটে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার কারণ কি? হযরত হাসান বলিলেন, উহার কারণ হইল, আল্লাহ পাক আলেমদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লইয়াছেন যে, তাহারা যেন মানুষের নিকট বর্ণনা করে এবং এলেম গোপন না করে। এরশাদ হইয়াছে–

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْتُمُوْنَهٗ

অর্থঃ "আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন যে, তাহা মানুষের নিকট বর্ণনা করিবে এবং গোপন করিবে না।"

(সূরা আলে এমরানঃ আয়াত ১৮৭)

হযরত হাসানের বক্তব্য শুনিয়া হাজ্জাজ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। অতঃপর হযরত হাসানকে কঠোর ভাষায় শাসাইয়া বলিল, ভবিষ্যতে আর কখনো যদি আপনার মুখে এইরূপ কথা শুনি, তবে আপনার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইবে।

অপর এক ঘটনার প্রকাশ– একবার হাতীত জাইয়াতকে হাজ্জাজের দরবারে হাজির করা হইলে হাজ্জাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমিই কি হাতীত? তিনি বলিলেনঃ হাঁ, আমিই হাতীত। আপনার যাহা মনে চায় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমি মাকামে ইবরাহীমে আল্লাহ পাকের সঙ্গে তিনটি অঙ্গীকার করিয়াছি। প্রথমতঃ আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইলে আমি সত্য জবাব দিব। দ্বিতীয়তঃ বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করিব। তৃতীয়তঃ নিরাপদ থাকিলে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করিব। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করিল, আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? জবাবে তিনি বলিলেন, আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা হইল আপনি জমিনের উপর আল্লাহর দুশমন। আপনি আল্লাহর হুকুম অমান্য করেন এবং অকারণে মানুষকে হত্যা করেন। হাজ্জাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমীরুল মোমেনীন আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? তিনি বলিলেন, আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান আপনার চাইতেও যঘন্য। তাহার অপকর্মের কোন অন্ত নাই। ইবনে মারওয়ানের অন্যতম অপরাধ হইল আপনার অস্তিত্ব।

হাতীত জাইয়াতের এই স্পষ্ট ভাষণে হাজ্জাজ ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিল এবং জল্লাদকে হুকুম দিল, যেন তাহাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। অতঃপর তাহার দেহে বাঁশের শলাকা বিদ্ধ করিয়া মাটিতে হেঁচড়ানো হইল। ফলে তাহার দেহের বিভিন্ন স্থান হইতে গোশত বিচ্ছিন্ন হইয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। কিন্তু এই কঠিন শাস্তির পরও তিনি উহ্ শব্দটি পর্যন্ত করিলেন না। এমনকি শাস্তি মওকুফের জন্য হাজ্জাজের নিকট ক্ষমাও চাহিলেন না এবং নিজের কষ্টের কথাও প্রকাশ করিলেন না। এক পর্যায়ে জল্লাদ হাজ্জাজকে জানাইল, অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার পর এখন সে মৃত্যুর প্রহর গুণিতেছে। হাজ্জাজ হুকুম দিল, এইবার তাহাকে সড়কের উপর নিয়া ফেলিয়া রাখ, যেন সাধারণ মানুষ তাহার পরিণতি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে।

জাফর বলেন, আমি এবং হাতীতের এক সুহৃদ তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হাতীত! তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি? সে পানি চাহিলে আমরা তাহাকে পানি আনিয়া দিলাম। পানি পান করার সঙ্গে সঙ্গে সে দুনিয়া হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিল। এই সময় তাহার বয়স হইয়াছিল মাত্র আঠার বৎসর।

বাদশাহকে উপদেশ দানে হযরত হাসান বসরীর অনুপম দৃষ্টান্ত

আমর ইবনে হুবায়রা ছিলেন ইরাকের গভর্ণর। একবার তিনি বসরা, কুফা, সিরিয়া ও মদীনার ফকীহ ও আলেমগণকে একত্রিত করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর তাহার ধারণা হইল, উপস্থিত আলেমগণের মধ্যে আমের শা'বী ও হাসান বসরী সকলের শীর্ষে। অতঃপর তিনি সকলকে বিদায় করিয়া এই দুইজনের সঙ্গে একান্তে আলোচনায় বসিলেন। প্রথমে তিনি আমের শা'বীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আবু আমর! আমি আমীরুল মোমেনীনের পক্ষ হইতে ইরাকের গভর্ণর। আমি তাহার একান্ত বিশ্বাসভাজন এবং তাহার আনুগত্যে আদিষ্ট। জনগণের হেফাজত এবং তাহাদের রক্ষাণাবেক্ষণ আমার অন্যতম দায়িত্ব। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে আমি আন্তরিক ও সচেতন। আমি জনগণের পরম হিতাকাংখী এবং তাহাদের কল্যাণের জন্য অবিরাম কাজ করিয়া যাইতেছি। কিন্তু এতসব কিছুর পরও তাহাদের কোন কোন আচরণে আমার মনে রাগ আসে এবং আমি তাহাদের ভাতা মওকুফ করিয়া তাহা বাইতুল মালে রাখিয়া দেই। অবশ্য আমার উদ্দেশ্য তাহাদিগকে বাইতুল মাল হইতে বঞ্চিত করা নহে; বরং আমার উদ্দেশ্য– তাহারা নিজেদের অপরাধ উপলব্ধি করিয়া অনুতপ্ত হইলেই আমি সেই ভাতা ফিরাইয়া দিব। কিন্তু আমীরুল মোমেনীন এজীদ যখন জানিতে পারেন যে, আমি অমুকের ভাতা মওকুফ করিয়া দিয়াছি তখন তিনি আমার নিকট নির্দেশ পাঠান, যেন সেই ভাতা আর ফেরৎ দেওয়া না হয়। এখন আমার সম্মুখে দোটানা অবস্থা। অর্থাৎ আমীরের হুকুম পালন করিইবা কেমন করিয়া এবং জনগণকেইবা তাহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করি কিভাবে? এই ক্ষেত্রে আমার কি করা উচিত, আর কি না করা উচিৎ তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। এই বিষয়ে আমি আপনার সুচিন্তিত পরামর্শ চাহিতেছি।

গভর্ণরের উপরোক্ত সমস্যার জবাবে শা'বী বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে নেকী দান করুন। বাদশাহ পিতৃতুল্য। তিনি ভুল-নির্ভুল উভয় প্রকার কাজই করিতে পারেন (সুতরাং এই বিষয়ে আপনার কোন দায়-দায়িত্ব নাই। আপনার কর্তব্য– বাদশাহর আনুগত্য করিয়া যাওয়া)।

এই জবাবে গভর্ণর ইবনে হুবায়রা প্রীত হইয়া বলিলেন, আল্লাহ পাকের শোকর যে, আমাকে কোনরূপ জবাবদিহি করিতে হইবে না। অতঃপর তিনি

হযরত হাসান বসরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, হে আবু সাঈদ! এই বিষয়ে আপনার মতামত কি?

হযরত হাসান বসরী বলিলেন, আপনি বলিয়াছেন যে, আপনি আমীরুল মোমেনীনের নায়েব, তাহার বিশ্বস্ত এবং তাহার আনুগত্যে আদিষ্ট। সেই সঙ্গে প্রজাসাধারনের সর্ববিধ মঙ্গল সাধন এবং তাহাদের হক সমূহের হেফাজত করাও আপনার কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। বাস্তবিক, জনগণের হক আদায় করা আপনার অন্যতম কর্তব্য এবং তাহাদের হিত কামনা আপনার উপর ওয়াজিব। আমি আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা কারাশী ছাহাবী হইতে এই হাদীছ শুনিয়াছি–

من استرعي رعية فلم يحطها النصيحة حرم الله عليه الجنة

অর্থাৎ– "যেই ব্যক্তি প্রজাদের শাসক হইয়া হিতকামনার সহিত তাহাদের হেফাজত করে না, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন।"

আপনি আরো বলিয়াছেন, কখনো কখনো আপনি প্রজাদের ভাতা বন্ধ করিয়া দেন যেন তাহারা নিজেদের ত্রুটি উপলব্ধি করিয়া আত্মসংশোধন করিতে পারে। কিন্তু আমীরুল মোমেনীন এজীদ যখন জানিতে পারেন যে, আমি কতক মানুষের ভাতা বন্ধ করিয়া দিয়াছি, তখন তিনি আমাকে এই মর্মে নির্দেশ পাঠান যেন তাহা আর ফেরৎ দেওয়া না হয়। এই ক্ষেত্রে আপনি যেমন আমীরুল মোমেনীনের হুকুম অমান্য করিতে পারেন না, তদ্রূপ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকেওবা কেমন করিয়া তাহাদের ভাতা হইতে বঞ্চিত করা হইবে তাহাও ভাবিয়া পান না।

আপনার এই সমস্যার প্রেক্ষিতে আমি আপনাকে পরামর্শ দিব– আমীরুল মোমেনীন যখনই আপনার উপর কোন হুকুম জারী করিবেন তখনই আপনি তাহা যাচাই করিয়া দেখিবেন যে, তাহা আল্লাহ পাকের হুকুমের অনুকূল কি-না। অর্থাৎ আমীরের নির্দেশ যদি আল্লাহর হুকুমের অনুকূল হয়, তবে নির্দ্বিধায় তাহা পালন করিবেন। পক্ষান্তরে আমীরের নির্দেশ যদি আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী হয়, তবে অবশ্যই তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। হে ইবনে হুবায়রা! আমি আপনার একজন হিতাকাংখী হিসাবে আপনাকে পরামর্শ দিতেছি–

আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহর দূত শীঘ্রই আপনার নিকট আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। সে আপনাকে শাহী তখত্ হইতে নামাইয়া দিবে এবং আপনাকে এই জৌলুসপূর্ণ প্রাসাদ হইতে বহিষ্কার করিয়া সংকীর্ণ কবরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পৌঁছাইয়া দিবে। সেই কঠিন দিনে আপনার আজিকার এই

রাজক্ষমতা ও ধনসম্পদ কিছুমাত্র কাজে আসিবে না। সকল কিছু পিছনে ফেলিয়া আপনাকে একেবারে শূন্য হাতে আল্লাহর দরবারে হাজির হইতে হইবে। সেই দিন কেবল আপনার নেক আমলই আপনার সহযোগী হইবে।

হে ইবনে হুবায়রা! আপনি এজীদকে ভয় করিতেছেন? আল্লাহ পাক আপনাকে এজীদের হাত হইতে রক্ষা করিবেন। কিন্তু এজীদের সাধ্য কি সে আপনাকে আল্লাহর আজাব হইতে রক্ষা করে? আল্লাহর আদেশ সকল আদেশের ঊর্ধ্বে এবং তাঁহার মর্জি সকল মর্জির ঊর্ধ্বে। আমি আপনাকে এমন আজাব হইতে সতর্ক করিতেছি, যাহা অপরাধীদের উপর অবশ্য নাজিল হইবে।

হযরত হাসান বসরী উপরোক্ত স্পষ্ট ভাষণে ইবনে হুবায়রা ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, হে শায়খ! আপনি ক্ষান্ত হউন এবং আমীরুল মোমেনীনের ব্যাপারে আপনার মতামত প্রত্যাহার করুন। কেননা, তিনিও একজন আলেম, মুসলমানদের শাসক এবং একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তাহার মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা আছে বলিয়াই আল্লাহ পাক তাঁহাকে মুসলমানদের শাসক নিযুক্ত করিয়াছেন।

হযরত হাসান বসরীর বলিলেন, হে ইবনে হুবায়রা! হিসাব-কিতাবের পর্যায়টি সামনে আসিতেছে। আল্লাহ পাক অপেক্ষা করিতেছেন। যথাসময় হক-নাহকের ফয়সালা হইবে এবং সেই দিন বেত্রের বদলে বেত্র ও গজবের বদলা গজব দ্বারাই হইবে। আমার একটি কথা স্মরণ রাখিবেন, যেই ব্যক্তি আপনাকে সৎ উপদেশ দেয় এবং আখেরাতের প্রতি উৎসাহিত করে, সে এমন ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম যে আপনাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে।

মোটকথা, হযরত হাসান বসরীর এইসব তিক্ত কথা গভর্ণর ইবনে হুবায়রার মনপূত হইল না এবং এক পর্যায়ে সে আলোচনা ভঙ্গ করিয়া উঠিয়া গেল। এই সময় শা'বী হযরত হাসানকে বলিলেন, হে আবু সাঈদ! আপনি তো অকারণে ইবনে হুবায়রাকে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন এবং তাহার পক্ষ হইতে আমাদের যাহা পাওয়ার আশা ছিল উহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইলাম। আমার এই কথায় হযরত হাসান আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন, শা'বী! তুমি আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাও এবং আর কখনো এইরূপ কথা বলিও না।

আমের শা'বী বলেন, উপরোক্ত ঘটনার পর হযরত হাসান বসরীর নিকট গভর্ণর হুবায়রার পক্ষ হইতে মূল্যবান উপঢৌকন আসিল এবং তাহার সম্মান বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু আমি এই সবের কিছুই পাইলাম না এবং গভর্ণরের সুনজর হইতেও বঞ্চিত হইলাম। বাস্তবিক হযরত হাসান বসরীর প্রতি যেই সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে তিনি উহার উপযুক্ত ছিলেন। আর আমাকে যেই অবজ্ঞা

করা হইল আমি উহারই উপযুক্ত ছিলাম। আমি হযরত হাসান বসরীর মত এমন আস্থাভাজন ও প্রাজ্ঞ আলেম আর দেখি নাই। আলেমদের সমাবেশে সর্বদাই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে এবং সকল ক্ষেত্রেই তিনি বিজয়ী হইয়াছেন। তিনি কথা বলিতেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আর আমরা কথা বলিতাম শাসক শ্রেণীকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। এই ঘটনার পর আমি আল্লাহ পাকের নিকট ওয়াদা করিলাম- কোন শাসককে খুশী করার জন্য আর কোন দিন তাহাদের শরণাপন্ন হইব না।

খলীফা মনসুরকে নসীহত

হযরত ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমার পিতৃব্য মোহাম্মদ ইবনে আলী বলিয়াছেন, একবার আমি খলীফা আবু জাফর মনসুরের দরবারে গেলাম। সেখানে ইবনে আবী জুআইব এবং মদীনার গভর্ণর হাসান ইবনে জায়েদও উপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে গেফার গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত হইল। তাহারা খলীফার নিকট মদীনার গভর্ণর হাসান ইবনে জায়েদের বিরুদ্ধে কতক অভিযোগ উত্থাপন করিল। খলীফা এই বিষয়ে ইবনে জায়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি বলিলেন, অভিযোগকারীগণ কেমন লোক এই বিষয়ে আপনি ইবনে আবী জুআইবকে জিজ্ঞাসা করুন। সেমতে খলীফা ইবনে আবী জুআইবকে অভিযোগকারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, ইহারা মানুষকে অপমান করে এবং অকারণে মানুষকে কষ্ট দেয়। খলীফা গেফারীগণকে বলিলেন, তোমাদের ব্যাপারে কি বলা হইল তাহা শুনিতে পাইলে তো? তাহারা বলিল, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি তাহার নিকট ইবনে জায়েদ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করুন। খলীফা ইবনে জায়েদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে ইবনে আবী জুআইব বলিলেন, ইবনে জায়েদ অন্যায়ভাবে ফায়সালা করেন। খলীফা ইবনে জায়েদকে বলিলেন, তোমার সম্পর্কে আবী জুআইবের রায় শুনিতে পাইলে? সে নেক মানুষ তাহার রায় অমূলক হইতে পারে না। গভর্ণর হাসান ইবনে জায়েদ বলিলেন, আমীরুল মোমেনীন! আবী জুআইবের নিকট আপনার নিজের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করুন। এইবার খলীফা স্বয়ং নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে ইবনে আবী জুআইব বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! এই বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। কিন্তু খলীফা আল্লাহর নামের কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলে অগত্যা তিনি বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আহরণ করিয়াছেন এবং এমন লোকদের পিছনে তাহা ব্যয় করিয়াছেন যাহারা উহার হকদার নহে। আমি ইহাও সাক্ষ্য দেই যে, আপনার ঘর হইতেই জুলুমের উৎপত্তি হইতেছে। এই কথা শুনিয়া খলীফা নিজের আসন ছাড়িয়া ইবনে আবী জুআইবের নিকট আসিলেন

এবং তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি এই স্থানে না বসিতাম, তবে রোম, পারস্য ও তুর্কিগণ তোমাদের নিকট হইতে এই আসন ছিনাইয়া লইত। কিন্তু ইবনে আবী জুআইব খলীফার এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনার পূর্বে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-ও খেলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁহারা ন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং প্রকৃত প্রাপকদের মাঝে তাহা বিতরণ করিয়াছেন। অথচ সেই যুগে রোম ও পারসিকদের মস্তক তাহাদের করতলগত ছিল। এই কথা শুনিয়া খলীফা মনসুর তাহাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি এই কথা না জানিতাম যে, আপনি সত্য কথা বলেন, তবে আজ আপনাকে অবশ্যই হত্যা করিতাম। ইবনে আবী জুআইব আল্লাহর নামের শপথ করিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আমি আপনার পুত্র মাহদীর চাইতেও আপনার অধিক হিতাকাংখী। এই কথা বলিয়াই তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইবনে আবী জুআইব খলীফার দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর হযরত সুফিয়ান ছাওরীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাত হইল। হযরত সুফিয়ান তাহাকে বলিলেন, আপনি ঐ জালেমের সঙ্গে যেইভাবে কথা বলিয়াছেন তাহাতে আমি অত্যন্ত খুশী হইয়াছি। কিন্তু আপনার একটি কথা আমার নিকট খারাপ লাগিয়াছে যে, আপনি তাহার পুত্রকে মাহদী (হেদায়েতপ্রাপ্ত) বলিয়াছেন। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। ইবনে আবী জুআইব বলিলেন, আমি তাহাকে সেই অর্থে মাহদী বলি নাই।

অনুরূপ অপর ঘটনা

আব্দুর রহমান ইবনে আমর আওযায়ী বর্ণনা করেন, একবার আমি সমুদ্র উপকূলে অবস্থান করিতেছিলাম। এই সময় খলীফা আবু জাফর মনসূর আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি যথা সময় দরবারে হাজির হইয়া তাহাকে ছালাম করিলাম। ছালামের জবাব দানের পর তিনি আমাকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এতদিন আসেন নাই কেন? আমি তাহার এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়া বলিলাম, আপনি আমাকে কি জন্য ডাকিয়াছেন, বলুন। তিনি বলিলেন, আমি আপনার সদুপদেশ দ্বারা উপকৃত হইতে চাই। আমি বলিলাম, আপনি যদি আমাকে এই উদ্দেশ্যেই আহবান করিয়া থাকেন, তবে আমি আপনাকে কিছু নসীহত করিব। আপনি তাহা স্মরণ রাখিবেন এবং ভুলিয়া যাইবেন না। খলীফা বলিলেন, আমি যখন নিজের গরজেই নসীহত প্রার্থনা করিতেছি, সুতরাং তাহা ভুলিয়া যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমি গভীর মনোযোগের সহিত আপনার কথা শুনিতেছি, আপনি বলুন। খলীফার এই কথার

জবাবে আমি বলিলাম, আমার আশংকা হইতেছে যে, আপনি আমার কথা শুনিবেন বটে কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করিবেন না। আমি এই কথা বলিতেই রবী' চিৎকার করিয়া উঠিয়া তলোয়ারের বাটে হাত রাখিল। খলীফা মনসুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, তুমি কি করিতেছ? ইহা ছাওয়াবের মজলিস– শাস্তির নহে। আমার প্রতি খলীফার এই সম্মানজনক আচরণে আমার মন প্রীত হইল এবং আমি প্রাণ খুলিয়া কথা বলার অনুকূল পরিবেশ পাইলাম। অতঃপর আমি বলিলাম, হে আমীরুল মোমেনীন! আমি মাকহুল হইতে এবং তিনি অতিয়্যা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

ايما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فانها نعمة من الله سيقت اليه فان قبلها بشكر و الا كانت حجة من الله ليزداد بها اثما و يزداد الله بها سخطا عليه ·

অর্থঃ "যেই ব্যক্তির নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে কোন নসীহত আসে, তাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে আগত নেয়মত বটে। সে যদি উহা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করে, তবে তো ভাল। অন্যথায় সেই নসীহতই আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ হইবে, যেন উহার কারণে তাহার গোনাহ বেশী হয় এবং আল্লাহ তাহার প্রতি বেশী অসন্তুষ্ট হন।" (ইবনে আবিদ্দুনয়া)

হে আমীরুল মোমেনীন! আমি মাকহুলের নিকট হইতে এবং মাকহুল অতিয়্যা ইবনে ইয়াসির হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

ايما وال مات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة

অর্থাৎ– "যেই শাসক প্রজাদের অকল্যাণকামী হইয়া মৃত্যুবরণ করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া, ইবনে আ'দী)

হে আমীরুল মোমেনীন! হক ও সত্যকে অপছন্দ করার অর্থ হইল, আল্লাহকে অপছন্দ করা। কেননা, আল্লাহ সত্য। আল্লাহ পাক আপনাকে খেলাফতের দায়িত্ব দ্বারা এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক দ্বারা ভাগ্যবান করিয়াছেন। আল্লাহর নবীর সহিত এই নৈকট্যের কারণে আল্লাহ পাক মানুষের অন্তর আপনার প্রতি নরম করিয়া দিয়াছেন। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও ক্ষমাশীল ছিলেন। উম্মতকে তিনি ভালবাসিতেন এবং উম্মতের নিকটও

তিনি প্রিয় ও প্রশংসনীয় ছিলেন। সুতরাং আপনারও কর্তব্য– সত্যের উপর আমল করা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, মানুষের ক্রটি গোপন করা, ফরিয়াদীর নিবেদন শ্রবণ করা, মজলুমের জন্য নিজের দরজা বন্ধ না করা এবং জনগণের দুঃখে দুঃখী ও তাহাদের সুখে সুখী হওয়া।

আমীরুল মোমেনীন! ইতিপূর্বে কেবল আপনার একার চিন্তা ছিল। এখন আপনার পক্ষে শুধু নিজেকে লইয়া চিন্তা করিলে চলিবে না। সকল মানুষের দায়িত্ব এখন আপনার মাথায়। আরব-আজম, মুসলিম-অমুসলিম সব আপনার সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত। সকলেই আপনার ইনসাফের প্রত্যাশী। বিচার দিবসে যদি এইসব লোক দাঁড়াইয়া আপনার বিরুদ্ধে জুলুম-নির্যাতন ও বেইনসাফীর অভিযোগ করে, তবে সেই কঠিন দিনে আপনার পরিণতি কি হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখুন।

আমীরুল মোমেনীন! আমি মাকহুলের নিকট হইতে এবং তিনি ওরওয়া ইবনে রোয়াইমের নিকট হইতে বর্ণনা করেন যে, একদিন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি খর্জুর বৃক্ষের ডাল ছিল। তিনি উহা দ্বারা মেসওয়াক করিতেন এবং মোনাফেকদিগকে সতর্ক করিতেন। এই প্রেক্ষিতে হযরত জিবরাঈল খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, হে মোহাম্মদ! আপনার হাতে এই ডালটি কেন যাহা দ্বারা আপনি উম্মতের মন ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন? (ইবনে আবিদ্দুনয়া)

আমীরুল মোমেনীন! এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন; যাহারা আল্লাহর বান্দাদের রক্ত প্রবাহিত করে, তাহাদের পিঠের চামড়া তুলিয়া ফেলে, তাহাদের শহর ও জনপদগুলি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে এবং তাহাদিগকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে, তাহাদের পরিণতি কি হইতে পারে।

হে আমীরুল মোমেনীন! আমি মাকহুল হইতে, তিনি জিয়াদ হইতে, তিনি হারেসা হইতে এবং হারেসা হাবীব ইবনে মুসলিমা হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নিজের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে বলিলেন। ঘটনাটি হইলঃ একবার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত দ্বারা তাহার অজ্ঞাতসারে এক বেদুঈনের গায়ে আঁচড় লাগিল। এই সময় হযরত জিবরাঈল খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, হে মোহাম্মাদ! আল্লাহ আপনাকে জালেম বা অহংকারীরূপে প্রেরণ করেন নাই। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে সেই বেদুঈনকে ডাকাইয়া বলিলেন, তুমি আমার নিকট হইতে (সেই আঘাতের) প্রতিশোধ গ্রহণ কর। বেদুঈন বিচলিত হইয়া সহসা আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর উৎসর্গ হউক। আমার দেহ আপনার সম্মুখে উপস্থিত, আপনি যদি

আপনার উপর উৎসর্গ হউক। আমার দেহ আপনার সম্মুখে উপস্থিত, আপনি যদি আমাকে প্রাণেও মারিয়া ফেলিতেন; তবুও আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করিতাম না। এই কথা শুনিয়া আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য দোয়া করিলেন। (ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

হে আমীরুল মোমেনীন! নিজের নফসের তরবিয়ত করুন এবং আল্লাহ পাকের নিকট শান্তি প্রার্থনা করুন। এমন জান্নাতের প্রত্যাশী হউন, যাহার প্রশস্ততা আসমান-জমিনের বরাবর এবং যেই জান্নাত সম্পর্কে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

لقيد قوس احدكم من الجنة خير له من الدنيا و ما فيها

অর্থাৎ– "তোমাদের মধ্যে কাহারো পক্ষে জান্নাতের এক ধনুক পরিমাণ স্থান অর্জিত হওয়া, পৃথিবী এবং উহার মধ্যস্থিত সকল কিছু অপেক্ষা উত্তম।" (ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

হে আমীরুল মোমেনীন! দুনিয়ার রাজত্ব যদি চিরস্থায়ী হইত, তবে তাহা আপনার পূর্ববর্তীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত এবং আপনি তাহা প্রাপ্ত হইতেন না। এই রাজত্ব যখন আপনার পূর্ববর্তীদের নিকট স্থায়ী হয় নাই, সুতরাং আপনার নিকটও স্থায়ী হইবে না। আপনিকি বলিতে পারেন, আপনার পিতামহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিম্নোক্ত আয়াতের কি তাফসীর করিয়াছেন–

لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا

অর্থঃ "ইহাতে যে ছোট-বড় কোন কিছুই বাদ দেয় নাই– সবই ইহাতে রহিয়াছে।" (সূরা কাহাফঃ আয়াত ৪৯)

তিনি বলিয়াছেন, এখানে ছগীরা অর্থ মুচকি হাসা এবং কবিরা অর্থ পূর্ণ হাসা। সুতরাং মুচকি হাসা ও পূর্ণ হাসারই যদি এই পরিণতি হয়, তবে হাত ও মুখের কাজের কি অবস্থা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

হে আমীরুল মোমেনীন! হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলিতেন, যদি ফুরাত নদীর তীরে একটি ছাগল ছানাও অনাহারে মারা যায়, তবে আমার আশংকা হইতেছে, উহার জন্যও আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, যাহারা আপনার আশেপাশে এবং আপনার শহরে বসবাস করে, তাহারা যদি আপনার ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত হয়, তবে উহার জবাবদিহিতা হইতে আপনি কেমন করিয়া রক্ষা পাইবেন?

আমীরুল মোমেনীন! আপনার পিতামহ নিম্নের আয়াতের কি তাফসীর করিয়াছেন, তাহা আমার জানা আছে–

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থঃ "হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করিয়াছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না। তাহা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া দিবে।"

(সূরা সোয়াদঃ আয়াত ২৬)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক যবুর কিতাবে স্বীয় পয়গম্বর হযরত দাউদ (আঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করিয়াছেন, হে দাউদ! যখন তোমার নিকট বাদী ও বিবাদী উপস্থিত হয় এবং তোমার মন তাহাদের কোন একজনের প্রতি ঝুকিয়া যায়, তখন এইরূপ কামনা করিও না যে, তোমার সেই ব্যক্তিই যেন তাহার প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী হয়। তুমি যদি এইরূপ কর, তবে আমি তোমার নবুওয়্যত ছিনাইয়া লইব। অতঃপর ভূপৃষ্ঠে তুমি আমার খলীফাও থাকিবে না এবং পয়গম্বর হওয়ার সৌভাগ্য হইতেও বঞ্চিত হইবে।

হে দাউদ! আমার রাসূলগণের অবস্থা যেন রাখালদের মত। তাহারা রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং নরমভাবে শাসন করে।

হে মুসলমানদের আমীর! আপনি এমন এক মহান দায়িত্ব সম্পাদনের কাজে নিয়োজিত যে, আসমান ও জমিনের সম্মুখে সেই দায়িত্ব পেশ করা হইলে উহারা তাহা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিত। হে আমীরুল মোমেনীন! আমার নিকট এজীদ ইবনে জাবের এবং তাহার নিকট আব্দুর রহমান ইবনে ওমর আনসারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) জনৈক আনসারীকে জাকাত উসুল করার কাজে নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই নিযুক্তির কয়েকদিন পরও তাহাকে মদীনায় বসবাসরত দেখিয়া হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দায়িত্ব দেওয়ার পরও তুমি জাকাত উসুল করিতে গেলেনা কেন? তুমি কি জান না যে, এই কাজে তুমি আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের সমান ছাওয়াব পাইবে? লোকটি আরজ করিল, আপনি যাহা মনে করিয়াছেন তাহা নহে; বরং আমার নিকট এই বিবরণ পৌঁছিয়াছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

ما من دال يلي شيئا من امور الناس الا اتى به يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه لا يفكها الا عدله ليوقف على جسر من النار و لينتفض به ذالك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه ثم يعاد فيحاسب فان كان محسنا

نجا باحسانه و ان كان مسيئا انخرق به ذالك الجسر فيهوي به في النار سبعين خريفا ·

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি মানুষের কোন কাজের কর্মকর্তা নিযুক্ত হইবে, কেয়ামতের দিন তাহার ঘাড়ে হাত বাঁধা অবস্থায় তাহাকে হাজির করা হইবে। আদল ও ন্যায় বিচার ছাড়া অন্য কিছু তাহার হাত খুলিতে পারিবে না। এই অবস্থায় তাহাকে জাহান্নামের পুলের উপর দাঁড় করানো হইবে। পুল তাহাকে এমনভাবে নাড়া দিবে যে, তাহার অঙ্গসমূহ স্থানচ্যুত হইয়া যাইবে। অতঃপর সে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে এবং তাহার হিসাব লওয়া হইবে। যদি সে সৎ কর্মশীল হয়, তবে সৎ কর্মের কারণে সে রক্ষা পাইবে। পক্ষান্তরে সে যদি বদকার হয়, তবে পুল উহার স্থান হইতে সরিয়া যাইবে এবং সে জাহান্নামের সত্তর বৎসর দূরত্বের নীচে গিয়া পতিত হইবে। (ইবনে আবিদ্দুনয়া)

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই হাদীছ কাহার নিকট শুনিয়াছ? সে বলিল, আমি হযরত আবু জর ও হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর নিকট এই হাদীছ শুনিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়কে ডাকাইয়া আনাইয়া সেই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উভয়ে হাদীসটির সত্যতা স্বীকার করিলেন। এইবার হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) হতাশা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, হায়! শাসনকার্যে এত অমঙ্গল থাকিলে এই দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবে? হযরত আবু জর (রাঃ) বলিলেন, যেই ব্যক্তির নাসিকা কর্তিত হয় এবং চেহারা মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়, সেই ব্যক্তিই এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

আওজায়ী বলেন, আমার উপরোক্ত নসীহত শোনার পর খলীফা রুমাল দ্বারা মুখ ঢাকিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার কান্না দেখিয়া আমার চোখেও পানি আসিয়া গেল। আমি আরজ করিলাম, আমীরুল মোমেনীন! আপনার প্রপিতামহ হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিব রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মক্কা, তায়েফ অথবা য়ামানের শাসন ক্ষমতা চাহিয়াছিলেন। উহার জবাবে পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, হে চাচাজান! আপনি যদি এক নফসকে (এবাদত ও রিয়াজত দ্বারা) জীবিত রাখেন, তবে তাহা এমন রাজত্ব অপেক্ষা উত্তম যাহা আপনি বেষ্টন করিতে পারিবেন না। (ইবনে আবিদ্দুনয়া)

প্রিয় চাচার হিতকামনা ও তাঁহার সহিত সম্পর্কের দাবীও ইহাই ছিল যে, তাঁহাকে ক্ষমতা ও নেতৃত্ব গ্রহণের বিপদশঙ্কুল পথে অগ্রসর হইতে নিষেধ করা। প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে তিনি আরো বলিয়াছিলেন যে, রোজ কেয়ামতে আমি আপনার কোন কাজেই আসিতে পারিব না। যখন এই

আয়াতটি নাজিল হইল– وَ أَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (অর্থঃ "আপনি নিকটতম আত্মীয়গণকে সতর্ক করিয়া দিন।" –সূরা আশশোআরাঃ আয়াত ২১৪) তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস, হযরত সাফিয়্যা এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–

انى لست اغني عنكم من الله شيئا ان لي عمل و لكم عملكم

অর্থঃ আল্লাহ তায়ালার নিকট আমি তোমাদের কোন কাজে আসিব না। আমার আমল আমার জন্য উপকারী হইবে এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য উপকারে আসিবে। (ইবনে আবিদ্দুনয়া)

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, যেই ব্যক্তির বুদ্ধি-বিবেচনা পরিপক্ক, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম, গৃহীত সিদ্ধান্তে অটল, দুর্ণীতি ও স্বজনপ্রীতি হইতে মুক্ত এবং যেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ব্যাপারে কোন তিরস্কারকের তিরস্কারকে ভয় করে না; এমন ব্যক্তিই শাসনকার্য পরিচালনা করার যোগ্য। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) আরো বলেন, শাসক চারি প্রকার–

১. যে নিজেও প্ররিশ্রম করে এবং কর্মচারীদের দ্বারাও পরিশ্রম করায়। এমন শাসক আল্লাহর পথে জেহাদাকারীদের মত এবং সে আল্লাহর রহমতের ছায়ায় থাকে।

২. দুর্বল শাসক। অর্থাৎ যেই শাসক নিজে পরিশ্রম করে বটে, কিন্তু প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা সে কাজ আদায় করিতে পারে না। এমন শাসক নিজের দুর্বলতার কারণেই ধ্বংসের মুখে পতিত হইবে। তবে আল্লাহ পাক যদি রহম করেন, তবে সে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

৩. এমন অলস শাসক যে নিজে আরাম-আয়েশে লিপ্ত থাকিয়া কর্মচারী দ্বারা কাজ আদায় করে। এইরূপ শাসক নিজে একা ধ্বংস হইবে।

৪. যেই শাসক অলসতা করিয়া নিজেও কোন কাজ করে না, রাত দিন কেবল ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে এবং কর্মচারীদিগকেও আমোদ-ফূর্তি ও বিবিধ বিনোদনে লিপ্ত রাখে; এইরূপ ক্ষেত্রে রাজা-প্রজা উভয় পক্ষই ধ্বংস হইবে।

হে আমীরুল মোমেনীন! আমার নিকট এই রেওয়ায়েত পৌঁছিয়াছে যে, একবার হযরত জিবরাঈল রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, আমি যখন আপনার নিকট আসি, তখন কেয়ামতের জন্য জাহান্নামের আগুন উত্তেজিত করা হইতেছিল (অর্থাৎ– কেয়ামত নিকটবর্তী)। আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হে জিবরাঈল! জাহান্নাম সম্পর্কে আমাকে কিছু বল। হযরত জিবরাঈল আরজ

করিলেন, আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আগুন জ্বালাইবার নির্দেশ দেওয়ার পর হাজার বৎসর যাবতৎ সেই আগুন প্রজ্বলিত করা হয়। ফলে উহা লাল বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আরো এক হাজার বৎসর জ্বালাইলে সেই আগুন পাণ্ডবর্ণ ধারণ করে। এইভাবে আরো এক হাজার বৎসর সেই আগুন জ্বালাইবার পর উহার বর্ণ কালো হইয়া যায়। অর্থাৎ– জাহান্নামের বর্ণ এখন বিভীষিকাময় অন্ধকারাচ্ছন্ন। জাহান্নামের বর্ণ কালো হওয়ার কারণে উহার শিখা দৃষ্টিগোচর হয় না এবং উহা নির্বাপিতও হয় না। সেই আল্লাহর কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন, জাহান্নামের একটি কীটও যদি দুনিয়ার মানুষকে দেখানো হয়, তবে উহার ভীবৎসতা দেখিয়া সমস্ত মানুষ সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাইবে। জাহান্নামের এক বালতি পানি যদি দুনিয়ার সমস্ত পানির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয়, তবে দুনিয়ার সমস্ত পানি এমন বিষাক্ত হইয়া যাইবে যে, উহা যে পান করিবে, সেই মারা যাইবে। জাহান্নামের শিকলের একটি কড়া যদি পৃথিবীর পাহাড় সমূহের উপর রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে উহার উত্তাপে সমস্ত পাহাড় গলিয়া অস্তিত্বহীন হইয়া যাইবে। কোন মানুষকে একবার জাহান্নামে প্রবেশ করাইবার পর যদি পুনরায় তাহাকে দুনিয়াতে আনা হয়, তবে তাহার ভীবৎস অবস্থা ও দুর্গন্ধের কারনে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মৃত্যুবরণ করিবে।

জাহান্নামের উপরোক্ত বিবরণ শোনার পর আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে হযরত জিবরাঈলও কাঁদিলেন। পরে হযরত জিবরাঈল আরজ করিলেন, হে মোহাম্মদ! আপনার তো অগ্র-পশ্চাতের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, উহার পরও আপনি কাঁদিতেছেন কেন? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেন, জিবরাঈল! আমি কি শোকরগুজার বান্দা হইব না? অতঃপর তিনি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তো রূহুল আমীন ও বিশ্বস্ত আত্মা এবং আল্লাহর ওহীর আমানতদার, তুমি কাঁদিলে কেন? হযরত জিবরাঈল আরজ করিলেন, আমার আশংকা হইতেছে যে, আমার অবস্থা আবার হারুত-মারুতের মত হইয়া যায় কিনা। এই কারণে আমি আমার মর্যাদার উপর ভরসা করিতে পারিতেছি না।

মোটকথা, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর ক্রন্দনের ফলে আসমান হইতে আওয়াজ আসিল, হে জিবরাঈল, হে মোহাম্মদ! তোমাদের দ্বারা কোন গোনাহ হওয়া এবং তোমাদিগকে আজাব দেওয়া এই উভয় বিষয় হইতে আমি তোমাদিগকে নিরাপত্তা দান করিলাম। মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব সকল পয়গম্বরের উপর এমন, যেমন জিবরাঈলের শ্রেষ্ঠত্ব ফেরেশতাকূলের উপর।

হে আমীরুল মোমেনীন! আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, হযরত ওমর (রাঃ) আল্লাহর দরবারে এইরূপ দোয়া করিয়াছেন, আয় পরওয়ারদিগার! বাদী-বিবাদী আমার আপনজন হউক বা না হউক তাহারা আমার নিকট হাজির হওয়ার পর আমি যদি কাহারো পক্ষপাতিত্ব করি, তবে আমাকে এক মুহূর্তও সুযোগ দিও না। আমীরুল মোমেনীন! সব চাইতে কঠিন কর্ম হইল, আল্লাহর হক আদায় করা। আর আল্লাহ পাকের নিকট সবচাইতে বড় বুজুর্গী হইল তাকওয়া। যেই ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ইজ্জত পাইতে চায়, আল্লাহ পাক তাহাকে ইজ্জত দান করেন। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করিয়া ইজ্জতের অধিকারী হইতে চায়, আল্লাহ পাক তাহাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন।

হে আমীরুল মোমেনীন! আপনার আহবানে সাড়া দিয়া আমি আপনাকে এই কয়টি নসীহত করিলাম। এখন আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন– এই কথা বলিয়াই আমি প্রস্থানোদ্যত হইলে খলীফা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনি এখন কোথায় যাইবেন? আমি বলিলাম, ইনশাআল্লাহ আমি এখন স্বদেশে আমার পরিবার পরিজনের নিকট যাইব। খলীফা আমাকে অনুমতি দিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে বহু মূল্যবান নসীহত করিয়াছেন। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনার নসীহত সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতঃ আমি উহার উপর আমল করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতেছি। আল্লাহ পাক মানুষকে সৎ কাজের তাওফীক দান করেন এবং তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী। সুতরাং আমি কেবল আল্লাহ পাকেরই সাহায্য কামনা করিতেছি এবং তাঁহার উপরই ভরসা করিতেছি। আমার জন্য তিনিই যথেষ্ট এবং তিনিই আমার উত্তম অভিভাবক। আমি আশা করিতেছি, ভবিষ্যতেও আমাকে আপনার নেক দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত করিবেন না। উপদেশদানে যেহেতু আপনার কোন ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত নাই; সুতরাং আপনার উপদেশ ফলপ্রসূ ও গৃহীত।

মোহাম্মদ ইবনে মুসইব বলেন, খলীফা মনসুর আওজায়ীকে যাবতীয় পাথেয় প্রদানপূর্বক তাঁহার সফরের আয়োজন সম্পন্ন করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আওজায়ী অতীব সৌজন্যের সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! এইসবে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। পার্থিব সম্পদের বিনিময়ে আমি আমার নসীহত বিক্রয় করিতে চাহি না। খলীফা মনসুর যেহেতু ইতিপূর্বেই আওজায়ীর তবীয়ত ও তাঁহার স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হইয়াছিলেন, সুতরাং এই বিষয়ে তাহাকে আর পীড়াপীড়ি করিলেন না এবং গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত এক অনাড়াম্বর ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

হযরত খিজির (আঃ)-এর নসীহত

মুহাজির বর্ণনা করেন, একবার খলীফা মনসুর পবিত্র হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। মক্কায় অবস্থানকালে তাহার নিয়ম ছিল– প্রতিদিন গভীর রাতে তিনি হরম শরীফ চলিয়া যাইতেন। সেখানে নেহায়েত এতমিনানের সহিত তাওয়াফ ও নফল নামাজ আদায় শেষে ফজরের পূর্বেই তিনি নিজ আবাসে চলিয়া আসিতেন। কেহ জানিতেও পারিত না যে, খলীফা প্রতি রাতে মাতাফে আসিয়া তাওয়াফ ও নামাজ আদায় করিয়া যাইতেছেন। এক রাতে খলীফা তাওয়াফ করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি মুলতাযামের নিকট আসিয়া শুনিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি দোয়া করিতেছে– আয় পরওয়ারদিগার! নাফরমানী ও ফেৎনা-ফাসাদে দুনিয়া ভরিয়া গিয়াছে এবং হকদারের হক প্রাপ্তিতে জুলুম ও লালসা অন্তরায় হইয়া আছে। এই কথা শুনিয়া খলীফা দ্রুত সেই লোকটির নিকটে গিয়া মনোযোগের সহিত তাহার মোনাজাত শুনিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি মসজিদের এক কোণায় গিয়া বসিলেন এবং খাদেমকে বলিলেন, মুলতাযামের সম্মুখে মোনাজাতরত ঐ লোকটিকে ডাকিয়া আন। খাদেম গিয়া লোকটিকে বলিল, তোমাকে আমীরুল মোমেনীন ডাকিয়াছেন। লোকটি হজরে আসওয়াদ চুম্বনের পর দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া খাদেমের সঙ্গে খলীফার নিকট আসিয়া হাজির হইল। খলীফা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মোনাজাতের মধ্যে তুমি যে বলিতেছিলে, ফেৎনা-ফাসাদে দুনিয়া ভরিয়া গিয়াছে এবং হকদারের হক প্রাপ্তিতে জুলুম ও লালসা অন্তরায় হইয়া আছে, এইসবের অর্থ কি? তোমার মুখে এইসব অভিযোগ শোনার পর হইতে আমি অন্তহীন পেরেশানী অনুভব করিতেছি। লোকটি আরজ করিল, আমীরুল মোমেনীন! আপনি যদি আমার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন, তবেই আমি এইসব অভিযোগের মর্ম খুলিয়া বলিব, খলীফা বলিলেন, আমি তোমাকে অভয় প্রদান করিলাম, তুমি নিশ্চিন্তে সব খুলিয়া বল। এইবার লোকটি বলিল, বস্তুতঃ যেই ব্যক্তির লোভ-লালসার কারণে হকদারের হক প্রাপ্তির পথে অন্তরায় সৃষ্টি হইয়া আছে, সেই ব্যক্তি স্বয়ং আপনি। এই কথা শুনিয়া খলীফা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, হতভাগা! আমার মধ্যে কি কারণে লোভ-লালসা আসিবে? দেশের যাবতীয় সম্পদ এবং ভালমন্দ সবই তো আমার করায়ত্বে। লোকটি বলিল, আপনি যাহাই বলুন না কেন, আপনার মধ্যে যেই পরিমাণ লোভ সৃষ্টি হইয়াছে, অপর কাহারো মধ্যে তাহা হয় নাই। আল্লাহ পাক আপনাকে মুসলমানদের শাসক নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনার কর্তব্য ছিল, জনগণের ধর্মকর্ম ও আর্থসামাজিক অবস্থার মানোন্নয়ন এবং তাহাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান। কিন্তু আপনি

সেই সবের ধারেকাছেও না গিয়া নিজের ভোগ-বিলাস ও সম্পদ সঞ্চয়ের ফিকিরে লাগিয়া গেলেন। আপনি নিজের ও জনগণের মাঝে ইট-সুরকির প্রাচীর, লৌহফটক ও সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করিয়া জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। রাজপ্রাসাদে আপনি বন্দী হইয়া আছেন এবং আপনার নিরাপত্তার জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন যে, উহার কারণে সাধারণ মানুষ বিচারের দাবী লইয়া আপনার শরণাপন্ন হইতে পারিতেছে না। রাজকর্মচারীগণকে আপনি অর্থ সংগ্রহ ও কর আদায়ের জন্য পাঠাইতেছেন। আপনার উজীর-মন্ত্রী, সহকারী ও সশস্ত্র প্রহরীদের এক বিরাট বাহিনী সর্বদা আপনাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখে। অথচ তাহাদের কর্তব্য এমন নহে যে, আপনি কিছু ভুলিয়া গেলে তাহারা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেয় বা উত্তম কর্মে আপনাকে সহযোগিতা করে কিংবা রাষ্ট্রীয় কাজে কোন ত্রুটির শিকার হইলে তাহারা আপনাকে শোধরাইয়া দেয়। বরং আপনি তাহাদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার খুলিয়া দিয়াছেন এবং অস্ত্র ও সওয়ারী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া জনগণের উপর জুলুম-নির্যাতন চালাইবার কাজে তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়া দিয়াছেন। আপনার এইসব অসাধু লোকেরা দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া জনগণের উপর চরম নির্যাতন চালাইতেছে। রাজদরবারে সাধারণ মানুষের আগমন আপনি একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং প্রহরীদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যেন নির্দিষ্ট কতক ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অপর কাহাকেও আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া না হয়। আপনি প্রহরীদিগকে এমন বলিয়া দেন নাই যে, কোন মজলুম ও বিপন্ন নাগরিক যদি আর্জি লইয়া আমার নিকট আসিতে চাহে, তবে তাহাদিগকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। আপনার প্রশাসনের সর্বকর্মা, উজীর-মন্ত্রী, সহচর ও মোসাহেবগণ যখন দেখিল যে, স্বয়ং খলীফা বিনা অধিকারে বাইতুল মালে সঞ্চিত মুসলমানদের সম্পদ নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করিতেছেন, তখন তাহারাও সরকারী সম্পদ লুটপাট ও খেয়ানতে জড়াইয়া পড়িল। তাহারা মনে করিল, আমাদের শ্রমে চালিত খলীফা যদি খেয়ানত করিতে পারেন, তবে আমরা পারিব না কেন? অতঃপর এই কায়েমী স্বার্থবাদীগণ লুটপাটের এই সর্গরাজ্য স্থায়ী রাখার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিল যে, তাহাদের অনুমোদন ব্যতীত জনগণের কোন প্রতিনিধি যেন আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে না পারে এবং কাহারো পক্ষ হইতে যেন কোনরূপ অভিযোগ আপনার গোচরে না আসে। প্রশাসনের কোন ব্যক্তি যদি আপনার যথার্থ হিতকামনায় রাষ্টের কোন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করিয়াছে তবে সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বার্থান্বেষী মহলটি তাহার বিরুদ্ধে বানোয়াট অভিযোগ তুলিয়া তাহাকে আপনার বিরাগ ভাজন করিয়া কর্মচ্যুত করিয়া ছাড়িয়াছে।

আপনার প্রশাসনের এইসব শীর্ষকর্মকর্তাদের কীর্তিকলাপের কারণে নিম্নস্তরের কর্মচারীগণ তাহাদিগকে ভয় করিয়া চলে। আর সুযোগমত উপঢৌকন দিয়া তাহাদিগকে হাত করিয়া রাখে যেন সাধারণ জনগণের উপর তাহারাও নির্বিচারে জুলুম করিয়া বৈষয়িক সুবিধা আদায় করিতে পারে। অনুরূপভাবে সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিগণও আমলাদিগকে ঘুষ দিয়া হাতে রাখে যেন তাহারাও প্রশাসনের পক্ষ হইতে বিবিধ সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে পারে। এইভাবেই গোটা দেশ অন্যায়-অবিচার ও জুলুম-নির্যাতনে ভরিয়া গিয়াছে এবং দুর্নীতিবাজ আমলাগণ আপনার ক্ষমতার অংশীদার হইয়া গিয়াছে।

কোন মজলুম যদি ফরিয়াদ লইয়া আপনার নিকট আসিতে চেষ্টা করে, তবে সে যেন কোন অবস্থাতেই আপনার নিকট আসিতে না পারে উহার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে। অনুরূপভাবে আপনি যখন সাধারণ মানুষের অবস্থা পরিদর্শনে যান, তখনও যেন কোন ফরিয়াদী প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ লইয়া আপনার নিকট ঘেঁষিতে না পারে উহার উপরও কড়াকড়ি ব্যবস্থা আরোপ করা হইয়াছে।

সাধারণ মনুষের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য আপনি একজন পরিদর্শক নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এই পরিদর্শকের উপরও আমলাদের পক্ষ হইতে এমন চাপ সৃষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছে যে, উহার ফলে ইচ্ছা থাকিলেও সে আমলাদের ভয়ে আপনার নিকট মুখ খুলিতে সাহস পাইতেছে না। আপনি জনগণের অবস্থা পরিদর্শনে যাওয়ার পর কোন মজলুম যদি হিম্মত করিয়া আপনার নিকট আসিয়া কোন অভিযোগ করিয়াছে, তবে আপনার আমলাদের নির্দেশে সিপাহীগণ বেদম প্রহারে তাহার জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। অথচ এইসবই আপনি নীরবে-নির্বিকারে দেখিয়া যাইতেছেন। না জালেমের জুলুমের প্রতিকার করিতেছেন, না মজলুমের উপর ইনসাফ কায়েম করিতেছেন। এক্ষণে আপনিই বলুন, ইসলাম এবং উহার নীতিমালার আর কিছুই কি অবশিষ্ট আছে? না আমরা মুসলমানরূপে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য আছি। ইতিপূর্বে বনু উমাইয়্যার শাসন ছিল। তখন রাজ দরবারে কোন মজলুম আসিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফরিয়াদ শোনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে কোন বিচারপ্রার্থী আসিলে আমলাগণ ব্যস্ত হইয়া তাহার প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

হে আমীরুল মোমেনীন! একবার আমি চীন সফরে গিয়াছিলাম। তখন সেই দেশের সরকার প্রধান খুব ন্যায় পরায়ন ছিলেন। আমি রাজ প্রাসাদে যাওয়ার পর লোকদের নিকট শুনিতে পাইলাম, বাদশাহ বধির হইয়া গিয়াছেন

এবং তিনি কিছুই শুনিতে পান না। শ্রবণশক্তি হারাইবার কারণে বাদশাহ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন এবং এই কারণে মাঝে-মধ্যে তিনি কান্নাকাটিও করিতেন। একদিন বাদশাহর উজীর তাহাকে কাঁন্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি শ্রবণশক্তি হারাইয়াছি, ইহাতে আমার কোন আক্ষেপ নাই। আমার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে। কিন্তু আমার আক্ষেপ হয়, যখন আমি কল্পনা করি যে, আমার মজলুম জনগণ হয়ত ফরিয়াদ লইয়া আমার দরবারে চিৎকার করিতে থাকিবে; কিন্তু আমি উহার কিছুই শুনিতে পাইব না। অতঃপর তিনি নিজেই দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিলেন, শ্রবণশক্তি হারাইয়াছি তাহাতে কি হইয়াছে? আমার দৃষ্টিশক্তি তো এখনো বিদ্যমান। উহা দ্বারাই আমি কাজ চালাইতে পারিব। তোমরা রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া দাও, এখন হইতে যাহারা কোনরূপ অন্যায়-অবিচার ও জুলুমের শিকার হইবে, তাহারা যেন লাল পোশাক পরিধান করে। মজলুম ব্যতীত অপর কেহ লাল পোশাক পরিধান করিতে পারিবে না। এই ব্যবস্থার পর তিনি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা জনগণের অবস্থা পরিদর্শনে বাহির হইতেন এবং লাল পোশাক দেখিয়াই মজলুমদিগকে সনাক্ত করিতে পারিতেন। অর্থাৎ এইভাবেই তিনি বধির হওয়ার পরও মজলুম জনগণ যেন ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত না হয়, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন।

আমীরুল মোমেনীন! একবার ভাবিয়া দেখুন, চীনের বাদশাহ ছিলেন একজন অমুসলিম। তাহার পরকালের ভয় ছিল না। তথাপি তিনি নিজ প্রজাদের প্রতি কতটা সদয় ছিলেন এবং ইনসাফ কায়েমে কতইনা আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন। আপনি তো একজন মুসলমান এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখেন। আপনি শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার বংশধর। এতসব বৈশিষ্ট্যের পরও আপনি মুসলমান প্রজাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করিতেছেন না। তদুপরি আপনি নিজের ব্যক্তিস্বার্থকে দেশ ও জাতির উপরে স্থান দিতেছেন এবং কেমন করিয়া বিপুল ধনৈশ্বর্যের মালিক হওয়া যায় উহার ফিকিরে লাগিয়া আছেন। আপনি যে কি কারণে এত সম্পদ জড়ো করিতেছেন তাহা বোধগম্য নহে। আপনি যদি বলেন যে, আমার আওলাদ-ফরজন্দ ও ভবিষ্যত বংশধরের জন্য এই সম্পদ রাখিয়া যাইতেছি, তবে উহার জবাবে আমি বলিব, ভবিষ্যতের ব্যবস্থা তো আল্লাহ পাক নিজেই করিয়া রাখিয়াছেন। দেখুন, একটি মানবশিশু যখন দুনিয়াতে আসে তখন সে একেবারেই রিক্ত হস্তে আসে এবং এই সময় সে পৃথিবীর একটি কানা কড়িরও মালিক থাকে না। আর পৃথিবীতেও এমন কোন বস্তু থাকে না যার কোন মালিক নাই। অথচ এই অবস্থায়ও আল্লাহ পাক শিশুটিকে তাহার আবশ্যকীয় বস্তু হইতে বঞ্চিত করেন না এবং যখন যাহা প্রয়োজন হয় উহার ব্যবস্থা করিয়া দেন। আপনি যদি বলেন যে, আমার ক্ষমতাকে সুসংহত ও স্থায়ী করার জন্যই আমি

সম্পদ সঞ্চয় করিতেছি, তবে আমি বলিব, এই ক্ষেত্রেও আপনার উদ্দেশ্য সফল হইবার নহে। একবার ভাবিয়া দেখুন, আপনার পূর্ববর্তী বহু শাসক অর্থ-কড়ি ও সোনা-দানার বিপুল সম্ভার গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই সম্পদ দ্বারা কি তাহারা নিজেদের ক্ষমতা স্থায়ী করিতে পারিয়াছে? মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পর অর্থবল-জনবল কিছুই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই। আপনি ভাবিয়া দেখুন, আল্লাহ পাক যখন ইচ্ছা করিলেন, তখন আপনাকে বিপুল সম্পদের মালিক বানাইলেন। ইতিপূর্বে আপনার এবং আপনার ভ্রাতাগণের সম্পদ কম ছিল– এই অজুহাতে আপনাকে সম্পদ হইতে বঞ্চিত করা হয় নাই।

আপনি যদি বলেন যে, বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা উন্নত জীবন যাপনের উদ্দেশ্যেই আমি সম্পদ সঞ্চয় করিতেছি, তবে স্মরণ রাখিবেন– পার্থিব সম্পদের কারণে আপনি জীবনে শান্তি লাভ করিবেন, এমন আশা করা অমূলক। বরং একমাত্র নেক আমলের মাধ্যমেই আপনি ইহকাল ও পরকালের স্থায়ী সুখ লাভ করিতে পারেন।

হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি কোন অপরাধীকে মৃতুদণ্ড অপেক্ষা অধিক কোন শাস্তি দিতে পারেন কি? খলীফা বলিলেন, না। লোকটি বলিল, তবে আপনি এমন রাজ্য দিয়া কি করিবেন যার ক্ষমতা আপনাকে দেওয়া হইয়াছে? আল্লাহ পাক তো কোন নাফরমান বান্দাকে মৃত্যুদণ্ড দেন না। বরং তিনি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। আপনি সেই দিনের কথা কল্পনা করুন, যেই দিন আল্লাহ পাক আপনার এই রাজক্ষমতা ছিনাইয়া লইবেন এবং প্রতিটি কর্মের হিসাব দানের জন্য সামনে দাঁড় করাইবেন। সেই কঠিন দিনে আপনার আজিকার এই রাজক্ষমতা ও ধনৈশ্বর্য কিছুই কাজে আসিবে না।

উপরোক্ত নসীহত শোনার পর খলীফা মনসুর অঝোর ধারায় কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর কান্না প্রশমন হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন, হায়! আমার যদি জন্মই না হইত, আমি যদি উল্লেখযোগ্য কোন ব্যক্তি না হইতাম। অতঃপর তিনি নসীহতকারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এখন তুমি আমাকে বল, আমি কি উপায়ে আমার দেশ ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করিব এবং কেমন করিয়াইবা স্বার্থান্বেষী আমলাদের কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিব। আমি তো চতুর্দিকে কেবল বিশ্বাসঘাতক ও স্বার্থপর লোকই দেখিতে পাইতেছি। এমন লোক কোথায় পাইব, যাহারা নিঃস্বার্থভাবে এবং আমানতদারীর সহিত আমার কাজে সহযোগিতা করিবে? লোকটি বলিল, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি উম্মতের শ্রেষ্ঠ দ্বীনদার ও পরহেজগার লোকদিগকে আপনার কাছে টানুন। তাহারা আপনাকে সঠিক পরামর্শ দিবে এবং রাজ্য পরিচালনায় আমানতদারীর সহিত আপনাকে সহযোগিতা করিবে। খলীফা জিজ্ঞাসা করিলেন, এইরূপ নিঃস্বার্থ পরহেজগার লোক কাহারা? লোকটি বলিল, হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

খলীফা বলিলেন, ওলামায়ে কেরাম আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকে। সে বলিল, আপনার গর্হিত আচরণের কারণেই তাহারা আপনাকে বর্জন করিয়া চলে। আজ হইতে আপনি শাহী ফটক উন্মুক্ত করিয়া সশস্ত্র প্রহরা হ্রাস করার নির্দেশ দিন। প্রয়োজনের সময় আম-খাস নির্বিশেষে সকলেই যেন আপনার শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত না হয় সেই ব্যবস্থা করুন। জালেমের নিকট হইতে মজলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করুন এবং জালেমকে তাহার জুলুম হইতে নিবৃত্ত করুন। হালাল উপায়ে সম্পদ আহরণ করুন এবং ইনসাফের সহিত তাহা প্রকৃত প্রাপকদের মধ্যে বিতরণ করুন। আপনি যদি আমার এই পরামর্শের উপর আমল করিতে পারেন, তবে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, আজ যাহারা আপনার নিকট হইতে দূরে সরিয়া আছে, কাল তাহারাই আপনার সান্নিধ্যে আসিবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বতোভাবে আপনাকে সাহায্য করিবে। খলীফা দোয়া করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! আমি যেন এই ব্যক্তির পরামর্শের উপর আমল করিতে পারি, আমাকে সেই তাওফীক দান কর। এমন সময় হরম শরীফের মোআজ্জিন আসিয়া জানাইল যে, নামাজের সময় হইয়াছে। খলীফা নামাজের তৈয়ারী করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সেই লোকটি কোথায় চলিয়া গেল। নামাজ শেষে খলীফা সেই লোকটিকে না পাইয়া রাজ রক্ষীকে নির্দেশ দিলেন, এই মাত্র যেই লোকটি আমার সঙ্গে কথা বলিতেছিল, তাহাকে খুঁজিয়া আন। যদি তাহার সন্ধান করিতে না পার, তবে তোমার গরদান উড়াইয়া দেওয়া হইবে।

খলীফার নির্দেশ পাইয়া রাজরক্ষী সেই লোকটির সন্ধানে বাহির হইল। বহু খোঁজাখুঁজির পর এক উপত্যকায় গিয়া দেখিল, সেই লোকটি গভীর মনোযোগের সহিত নামাজ পড়িতেছে। ছালাম ফিরাইবার পর রক্ষী নিকটে গিয়া লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আল্লাহকে ভয় করেন? লোকটি বলিল, হাঁ! আমি আল্লাহকে ভয় করি। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি তাঁহাকে চিনেন? লোকটি বলিল, হাঁ! আমি আল্লাহকে চিনি, এইবার রাজরক্ষী বলিল, আপনি যদি আল্লাহর পরিচয় ও মারেফাত হাসিল করিয়া থাকেন এবং তাহাকে ভয়ও করেন, তবে আমার সঙ্গে চলুন। আমীরুল মোমেনীন আপনাকে তলব করিয়াছেন। তিনি শপথ করিয়াছেন, আমি যদি আপনাকে লইয়া যাইতে না পারি, তবে তিনি আমাকে হত্যা করিবেন। লোকটি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, এখন তো আমি যাইতে পারিব না। তবে আমি না যাওয়ার কারণে তিনি তোমাকে হত্যা করিবেন না। রাজরক্ষী উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লোকটি তাহাকে প্রশ্ন করিল, তুমি কি পড়িতে পার? সে বলিল, না আমি পড়িতে পারি না। অতঃপর লোকটি থলি হইতে একটি কাগজ বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, এইটি তোমার পকেটে রাখিয়া দাও। ইহাতে প্রশস্ততার দোয়া লিখিত আছে।

রক্ষী জিজ্ঞাসা করিল, প্রশস্ততার দোয়া কি? লোকটি বলিল, এই দোয়া শহীদগণ ব্যতীত অপর কাহাকেও দেওয়া হয় না। রাজরক্ষী বলিল, হে শায়েখ! আপনি যখন আমার উপর এতই অনুগ্রহ করিয়াছেন, তো আমাকে সেই দোয়াটি বাতাইয়া দিন এবং উহার গুনাগুণও বলিয়া দিন। লোকটি বলিল, যেই ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই দোয়া পাঠ করিবে–

- ০ তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে,
- ০ তাহার জন্য স্থায়ী শান্তি লিখিয়া দেওয়া হইবে,
- ০ তাহার দোয়া কবুল হইবে,
- ০ তাহাকে পর্যাপ্ত রিজিক দেওয়া হইবে,
- ০ তাহার ইচ্ছা পূরণ হইবে,
- ০ শত্রুর উপর জয়ী হইবে,
- ০ আল্লাহ পাকের নিকট সে ছিদ্দিকীনগণের মধ্যে গণ্য হইবে এবং–
- ০ তাহার শাহাদাতের মৃত্যু নসীব হইবে।

দোয়াটি এই–

اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء و علوت بعظمتك على العظماء و علمت ما تمت ارضك كعلمك بما فوق عرشك و كانت وساوس الصدور كالعلانية عندك و علانية القول كالسر في علمك و انقاد كل شيء بعظمتك و خضع كل ذي سلطان سلطانك و صار امر الدنيا و الاخرة كلمة بيدك اجعل لي من كل هم امسيت فيه فرجا و مخرجا ·

اللهم ان عفوك عن ذنوبي و تجاوزك عن خطيئتي و سترك على قبيح عملي اطمعني ان اسئلك ما لا استوجبه لما قصرت فيه ادعوك امنا و اسئلك منانسا انك المحسن لي و انا المسيء الى نفسي فيما بيني و بينك تتور الى بالنعم و ابتغض اليك بالمعاصي و لكن الثقة بك حملتني على الجرأة عليك فعد بفضك و احسانك على انك انت التواب الرحيم *

অর্থঃ "আয় আল্লাহ! আপনি নিজ আজমতে সকল পবিত্র হইতে পবিত্র এবং নিজ আজমত দ্বারা সকল মহান অপেক্ষা মহান। ভূগর্ভের অবস্থা আপনি এমনভাবে জ্ঞাত, যেমন আরশের উপরের অবস্থা সম্পর্কে আপনি পরিজ্ঞাত। অন্তরের গোপন কথা আপনার নিকট প্রকাশ্য কথার মত এবং প্রকাশ্য কথা আপনার নিকট গোপন কথার মত (অর্থাৎ– গোপন ও প্রকাশ্য সবই আপনার নিকট সমান)। আপনার আজমত ও মহত্ত্বের সামনে সকল কিছু হীন এবং

সকল সুলতান তুচ্ছ আপনার সালতানাতের সম্মুখে। ইহ-পরকালের সকল কিছু আপনার করায়ত্ব। আমাকে এমনসব দুর্ভাবনা হইতে মুক্তি দিন যাহাতে আমি লিপ্ত।

আয় আল্লাহ! আপনি তো আমার গোনাহ ক্ষমা করিয়াছেন, আমার ত্রুটি মার্জনা করিয়াছেন এবং আমার মন্দ কাজগুলি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন – এই বিষয়গুলি আমাকে আশান্বিত করিয়াছে যে, আমি আপনার নিকট এমন বিষয় প্রার্থনা করিব– আপন গোনাহের কারণে আমি যাহা পাওয়ার যোগ্য নহি। আমি অবাধে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। নিশ্চয়ই আপনি আমার উপর অনুগ্রহ করেন, আর আমি নিজের উপর অন্যায় করি। আপনি নেয়মত দান করিয়া আমাকে বন্ধু বানান, আর আমি গোনাহ করিয়া আপনাকে অসন্তুষ্ট করি। কিন্তু আপনার উপর আস্থা ও ভরসা, সাহস প্রদর্শনে আমাকে উৎসাহিত করে। আমার উপর আপনার ফজল ও এহসান আগের মতই অব্যাহত রাখুন। নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী, দয়ালু।"

রাজরক্ষী বলে, আমি পত্রটি লইয়া যথা সময় খলীফার দরবারে হাজির হইলাম। তাহাকে ছালাম করিতেই তিনি মাথা তুলিয়া আমার দিকে তাকাইলেন। অতঃপর মৃদ হাস্য করিয়া আমাকে বলিলেন, মনে হয় তুমি যাদু জান। আমি বলিলাম, হে আমীরুল মোমেনীন! আল্লাহর শপথ, আমি যাদু জানি না। অতঃপর আমি আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করিলাম। ঘটনার বিবরণ শোনার পর খলীফা বলিলেন, লোকটি তোমাকে যেই কাগজ দিয়াছে, তাহা বাহির কর। আমি পকেট হইতে সেই কাগজটি বাহির করিয়া খলীফার হাতে দিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি আজ বড় বাঁচিয়া গেলে। অন্যথায় আজ তোমাকে অবশ্যই হত্যা করা হইত। অতঃপর তিনি সেই কাগজটি নকল করাইয়া রাখিলেন এবং আমাকে দশ হাজার দেরহাম বখশিশ দিলেন। পরে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বলিতে পার, সেই লোকটি কে? আমি এই বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে খলীফা বলিলেন, তিনি হযরত খিজির (আঃ)।

খলীফা হারুনুর রশীদের প্রতি হযরত সুফিয়ান ছাওরীর সতর্ক নসীহত

আবু এমরান জওফী (রহঃ) বলেন, খলীফা হারুনুর রশীদ খেলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর তৎকালীন দেশের প্রায় সকল শ্রেণীর আলেম তাহাকে মোবারকবাদ জানাইবার উদ্দেশ্যে রাজ দরবারে আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। খলীফাও রাজকোষ উজাড় করিয়া তাহাদিগকে বিপুল পরিমাণে হাদিয়া-তোহফা প্রদান করেন। খলীফা হারুনুর রশীদ খেলাফত লাভের পূর্বে তৎকালীন ওলামায়ে কেরাম ও সূফী-সাধকগণের সাহচর্যে সময় কাটাইতেন

এবং বিশেষতঃ সেই যুগের প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত সুফিয়ান ছাওরীর সঙ্গে তাহার গভীর সম্পর্ক ছিল। খলীফা হওয়ার পর সেই যুগের প্রায় সকল আলেম সাক্ষাত করিয়া তাহাকে মোবারকবাদ জানান বটে, কিন্তু হযরত সুফিয়ান ছাওরী উহা হইতে বিরত থাকেন। অথচ খলীফা এই সময় আন্তরিকভাবে হযরত সুফিয়ান ছাওরীর সাক্ষাত কামনা করিতেছিলেন এবং তাহার অসাক্ষাত খলীফার নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হইতেছিল। পরে তিনি হযরত সুফিয়ানের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর বান্দা হারুনুর রশীদ আমীরুল মোমেনীনের পক্ষ হইতে তাহার ভাই সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ইবনে মুনজিরের নামে–

আম্মা বা'দ, জনাবে মোহতারাম! আপনার ইহা ভাল করিয়াই জানা আছে যে, আল্লাহ পাক মোমেন বান্দাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সম্পর্ককে নিজের জন্য নিজের সম্পর্কে সাব্যস্ত করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, আমি আপনার সঙ্গে যেই সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়াছি তাহা ছিন্ন করি নাই এবং আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বেরও অবসান ঘটে নাই। বরং আন্তরিকভাবে এখনো আমি আপনার প্রতি উত্তম অনুরাগ ও গভীর আস্থা পোষণ করিতেছি। আমার মাথায় যদি খেলাফতের গুরু দায়িত্ব অর্পিত না হইত, তবে অতি আদবের সহিত আমি আপনার খেদমতে আসিয়া হাজির হইতাম। কেননা, আমার অন্তর আপনার প্রতি অন্তহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মোহাব্বতে পরিপূর্ণ।

হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি হয়ত অবগত হইয়াছেন যে, আপনার এবং আমার বন্ধু মহলের মধ্যে এমন কেহ নাই, যে আমাকে মোবারকবাদ জানাইতে আসে নাই। আমি তাহাদের জন্য বাইতুল মাল উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদের মধ্যে মূল্যবান উপঢৌকন বিতরণ করিয়াছি এবং উহার ফলে আমি যথার্থ আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। কিন্তু আপনি যেহেতু এখনো আগমন করেন নাই, এই কারণে আপনার প্রতি আমার মনের গভীর অনুরাগ প্রকাশের উদ্দেশ্যেই আজ পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। একজন মোমেনের সঙ্গে সাক্ষাত করা, তাহার সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা এবং উহা স্থায়ী রাখার কি ফজিলত তাহা আপনার ভাল করিয়াই জানা আছে। সুতরাং আমার এই পত্র আপনার হাতে পৌঁছাইবার পর কালবিলম্ব না করিয়া আপনি আমার এখানে তাশরীফ আনয়ন করুন।

পত্র লেখা সম্পন্ন হওয়ার পর খলীফা উপস্থিত সকলের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। অর্থাৎ পত্রটি হযরত সুফিয়ান ছাওরীর নিকট কে বহন করিয়া লইয়া যাইবে এই বিষয়ে সকলের মতামত জানিতে চাহিলেন। কিন্তু হযরত সুফিয়ান ছাওরীর উষ্ণ স্বভাব ও জালালী তবিয়ত সম্পর্কে যেহেতু সকলেই অবগত ছিল,

এই কারণে কেহই পত্র লইয়া যাইতে সাহস করিল না। অবশেষে খলীফা ওব্বাদ তালেকানী নামে এক দারোয়ানকে দায়িত্ব দিয়া প্রেরণ করিলেন। যাওয়ার সময় খলীফা তাহাকে বিশেষভাবে হেদায়েত দিয়া বলিলেন, কুফা নগরীতে গিয়া তুমি মানুষের নিকট ছওর গোত্রের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিবে। সেই গোত্রে গিয়া হযরত সুফিয়ান ছাওরীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার সাক্ষাত পাইবে। সেখানে তুমি যাহা যাহা দেখিবে ও শুনিবে গভীর মনোযোগের সহিত তাহা স্মরণ রাখিবে যেন ফিরিয়া আসিয়া তাহা হুবহু আমার নিকট বর্ণনা করিতে পার। খলীফার পত্রবাহী দূত কুফার ছওর গোত্রে গিয়া লোকদের নিকট হযরত সুফিয়ান ছাওরীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। লোকেরা তাহাকে জানাইল, তিনি মসজিদে অবস্থান করিতেছেন। দূত বলে, আমি সেই মসজিদের দিকে আগাইলাম, কিন্তু আমি মসজিদের নিকটবর্তী হইতেই হযরত সুফিয়ান ছাওরী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, আমি আল্লাহ পাকের নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে পানাহ চাহিতেছি। আয় আল্লাহ!! আমি এমন আগন্তুক হইতে পানাহ চাহিতেছি, যাহার আগমন অনিষ্টকর বৈ কল্যাণকর নহে। হযরত সুফিয়ানের এইসব কথার প্রভাবে আমি বিচলিত হইয়া পড়িলাম। পরে যখন তিনি দেখিলেন যে, আমার সওয়ারী মসজিদের সম্মুখে থামিয়াছে এবং আমি সেখানেই অবতরণ করিব তখন তিনি নামাজ পড়িতে শুরু করিলেন। অথচ তখন কোন নামাজের সময় ছিল না। আমি মসজিদের ভিতরে গিয়া দেখিলাম, সেই বুজুর্গের সহচরগণ তাহার সম্মুখে এমনভাবে বসিয়া আছে যেন একদল চোর হাকিমের সম্মুখে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শাস্তির অপেক্ষা করিতেছে। আমি তাহাদিগকে ছালাম করিলাম, কিন্তু তাহারা মুখে কিছুই না বলিয়া কেবল হাতের ইশারায় ছালামের জবাব দিল। আমি সেখানে ঠায় দাঁড়াইয়া রহিলাম, কেহ আমাকে বসিতেও বলিল না। ঘটনার শুরু হইতেই আমি বিব্রত বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু এই পর্যায়ে আমার মনে রীতিমত ভীতির সঞ্চার হইল। অবস্থা দৃষ্টে ইতিপূর্বেই আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে, যেই বুজুর্গ নামাজ পড়িতেছেন তিনিই প্রখ্যাত সূফি সাধক হযরত সুফিয়ান ছাওরী। আমি সাবধানতার সহিত খলীফার পত্রটি তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিলাম। কিন্তু উহার প্রতি নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আঁৎকাইয়া উঠিলেন এবং এমনভাবে আত্মরক্ষা করিলেন যেন সম্মুখে বিষধর সর্প দেখিয়াছেন। নামাজ শেষে তিনি হাতে জামার প্রান্ত জড়াইয়া পত্রটি হাতে লইলেন এবং পিছনে উপবিষ্ট সহচরগণের দিকে তাহা নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তোমাদের কেহ পত্রটি পাঠ করিয়া দেখ। আমি তো এমন বস্তুতে হাত লাগানো হইতে আল্লাহর পানাহ চাহিতেছি– যাহা কোন জালেম স্পর্শ করিয়াছে।

শায়েখের সহচরদের একজন পত্রটিকে এমন ভয়ে ভয়ে খুলিল যেন উহার অভ্যন্তরে বিষধর সাপ মুখ হা করিয়া বসিয়া আছে এবং সুযোগ পাইলেই উহা মানুষকে দংশন করিবে। যাহাই হউক, সে পত্রটি পাঠ করিয়া শোনাইলে শায়েখ

বলিলেন, পত্রটির অপর পৃষ্ঠায় উহার জবাব লিখিয়া দাও। সহচরগণ বলিল, হে আবু আব্দুল্লাহ! ইহা স্বয়ং খলীফার পত্র। সুতরাং একটি ভাল কাগজে উহার জবাব লেখা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তিনি বলিলেনঃ না, আমি যেইভাবে বলিয়াছি সেইভাবেই লিখ। জালেমের পত্রের জবাব উহার অপর পৃষ্ঠায় লেখাই যথেষ্ট। সে যদি এই কাগজটি হালাল উপায়ে সংগ্রহ করিয়া থাকে, তবে উহার ছাওয়াব পাইবে। অন্যথায় উহার জন্য তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আমাদের নিকট এমন কোন বস্তু থাকা উচিৎ নহে যাহা কোন জালেম স্পর্শ করিয়াছে। কেননা, উহার ফলে আমাদের দ্বীনদারী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সহচরগণ জিজ্ঞাসা করিল, চিঠির জবাবে কি লিখিব? তিনি বলিলেন, লিখ–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

গোনাহগার বান্দা সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ইবনে মুনজির ছাওরীর পক্ষ হইতে প্রতারিত হারুনুর রশীদের প্রতি, যার ঈমানের স্বাদ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমি তোমাকে এই বিষয়ে অবগত করার জন্য পত্র লিখিতেছি যে, আমি তোমার সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিয়াছি এবং এখন হইতে আমি তোমার শত্রুতে পরিণত হইয়াছি। কেননা, তুমি আমাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছ যে, তুমি বাইতুল মালের সম্পদ এমন ব্যক্তিদের পিছনে উজাড় করিয়া দিয়াছ, যাহারা উহার প্রকৃত প্রাপক নহে। তুমি কেবল উহা করিয়াই ক্ষান্ত হও নাই; বরং আমাকেও উহার সাক্ষী বানাইয়াছ। অথচ আমি তোমার নিকট হইতে অনেক দূরে ছিলাম এবং তোমার সম্পর্কে আমার কিছুমাত্র অবগতি ছিল না। কিন্তু এখন তোমার চিঠির মাধ্যমে তোমার প্রকৃত অবস্থা আমরা জানিতে পারিয়াছি। সুতরাং আমি এবং আমার সেইসব সহচর যাহারা তোমার পত্র পাঠ করিয়াছে রোজ কেয়ামতে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিব।

হারুন! রাজকোষের সম্পদের যাহারা প্রকৃত মালিক তাহাদের অমতে তুমি ঐ সম্পদ অপচয় করিয়াছ। তোমার এই কাজে কোন্ দলটি খুশী হইয়াছে? ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য যাহাদিগকে দান করা হয় তাহারা? না জাকাতের কর্মচারী, আল্লাহর পথে জেহাদকারী, মুসাফির, হাফেজ-আলেম, বিধবা, এতীম ইত্যাদি কোন্ শ্রেণীটিকে তুমি খুশী করিতে পারিয়াছ? তুমি কি মনে কর যে, দেশের প্রজাসাধারণ তোমার এই কাজটি সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লইয়াছে?

হে হারুন! এখন তুমি বিচার দিবসের হিসাবের জন্য প্রস্তুত হও। শীঘ্রই তোমাকে রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাজির হইতে হইবে এবং সেখানে তোমার প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। কেননা, তুমি এলেম, এবাদত, তেলাওয়াত এবং আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের ধারাবাহিকতা ছিন্ন

করিয়া দিয়াছ এবং নিজেদের জন্য জালেমদের নেতৃত্ব পছন্দ করিয়াছ।

হে হারুন! তুমি রেশমী বস্ত্র পরিধান করতঃ রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিতেছ এবং দরজায় পর্দা ঝুলাইয়া সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতেছ। তোমার ফটকে এমন জালেম প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছ যাহারা নিরীহ প্রজাদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার করে। এইসব প্রহরীগণ নিজেরা শরাব পান করে এবং অপর কেহ শরাব পান করিলে তাহাকে শাস্তি প্রদান করে। নিজেরা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং অপর কেহ এই কর্মে লিপ্ত হইলে তাহার উপর শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করে। অনুরূপভাবে তাহারা নিজেরা চুরি করে এবং অপর কেহ চুরি করিলে তাহার হস্ত কর্তন করে। অর্থাৎ অবস্থা দৃষ্টে মনে হইতেছে যেন শরীয়তের বিধিবিধান তোমার ও তোমার প্রশাসনের জন্য প্রযোজ্য নহে এবং উহা কেবল তোমার প্রজাদের জন্যই নাজিল হইয়াছে।

হে হারুন! সেই দিন তোমার কি দশা হইবে যখন আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইবে–

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَ اَزْوَاجَهُمْ

অর্থঃ "একত্রিত কর জালেমদিগকে এবং তাহাদের দোসরদিগকে।"

(সূরা আসসাফফাতঃ আয়াত ২২)

হে হারুন! তোমাকে এবং তোমার সাহায্যকারী জালেমদিগকে ঘাড়ের সহিত হাত বাঁধা অবস্থায় আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির করা হইবে। তোমার ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া অন্য কিছু এই বন্ধন খুলিতে পারিবে না। তোমার সহযোগী জালেমগণ তোমার চতুর্দিকে থাকিবে। তুমি দলপতি হইয়া তাহাদিগকে জাহান্নামে লইয়া যাইবে।

হে হারুন! আমি যেন তোমার পরিণতি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি– রোজ কেয়ামতে তোমার ঘাড় ধরিয়া আল্লাহর দরবারে হাজির করা হইয়াছে। তোমার নেকীসমূহ তুমি অপরের পাল্লায় দেখিতে পাইতেছ এবং তোমার নিজের পাল্লায় নিজের গোনাহের সঙ্গে অপরের গোনাহসমূহও দেখিতে পাইতেছ। সেই কঠিন বিপদের দিনে তোমার চতুর্দিকে একের পর এক বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে।

হে হারুন! তোমার একজন সত্যিকার হিতাকাংখী হিসাবে আমি তোমাকে নসীহত করিয়া যাইতেছি; আমার কথাগুলি তোমার অন্তরে গাঁথিয়া রাখিও এবং উহার উপর আমল করিও। প্রজাসাধারণের ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় করিও এবং উম্মতের ব্যাপারে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাকে আলোকবর্তিকা হিসাবে গ্রহণ করিও। মনে রাখিও, শাসন ক্ষমতা যদি কোন স্থায়ী বিষয় হইত, তবে কোনভাবেই তুমি তাহা প্রাপ্ত হইতে না। এই শাসন ক্ষমতা যেমন তোমার পূর্ববর্তীদের নিকট স্থায়ী হয় নাই, তদ্রূপ তোমার নিকট হইতেও একদিন তাহা ছিনাইয়া লওয়া হইবে। অর্থাৎ এই মর্তলোকের অবস্থাই এমনি বিবর্তনশীল যে, এখানে কোন কিছুই স্থায়ী হয় না। বুদ্ধিমান লোকেরা এই ক্ষণস্থায়ী জীবন হইতে পরকালের অনন্ত সফরের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লয়। আবার এক শ্রেণীর লোক ইহকাল-পরকাল উভয় জাহানেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হে হারুন! আমি তোমাকে সেইসব ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যেই দেখিতেছি, যাহারা নিজেদের দুনিয়াও শেষ করিতেছে এবং আখেরাতও বরবাদ করিতেছে। আমার এই সংক্ষিপ্ত কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া সেই অনুযায়ী আমল করিলে তুমি লাভবান হইবে। এখন আমি শেষ করিতেছি। ওয়াস্‌সালাম।

ওব্বাদ তালেকানী বলে, হযরত সুফিয়ান ছাওরীর পত্র লেখা সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি উহা আমার দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। পত্রটি ভাঁজ করিয়া খামের ভিতর ভরিয়া দিলেন না এবং উহাতে সিল মোহরও লাগাইলেন না। যাহাই হউক, আমি পত্রটি লইয়া রওনা হইলাম। হযরত সুফিয়ান ছাওরীর নসীহত ইতিপূর্বেই আমার অন্তরে ক্রিয়া শুরু করিয়াছিল। আমি কুফার বাজারে আসিয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিলাম, ভাই সকল! এক ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নিকট হইতে পলাতক ছিল। এখন সে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। আপনারা কেহ তাহাকে ক্রয় করিবেন কি? আমার এই ঘোষণার পর কতক লোক দেরহাম লইয়া আমার নিকট হাজির হইল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, এইসবে আমার কোন প্রয়োজন নাই, আমার কেবল একটি জুব্বা ও একটি কম্বল চাই। লোকেরা আমাকে জুব্বা ও কম্বল আনিয়া দিল। আমি রাজকীয় পোশাক খুলিয়া সেইগুলি পরিধান করিলাম। আমার সঙ্গের অস্ত্রটি ঘোড়ার পিঠে রাখিয়া দিলাম এবং ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া খালি পায়ে হাঁটিয়া রওনা হইলাম।

রাজমহলে পৌঁছাইবার পর লোকেরা আমার অদ্ভুত পোশাক, খালি পা, ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া পদব্রজে আগমন ইত্যাদি অবস্থা দেখিয়া অবাক হইল। অনেকে তো আমাকে লইয়া দস্তুর মত তামাশা করিতে লাগিল। পরে খলীফাকে আমার উপস্থিতির সংবাদ দেওয়া হইল এবং আমি যথা সময় তাঁহার খেদমতে হাজির হইলাম। আমার উপর নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খলীফার চেহারায় ভাবান্তর দেখা দিল। কিছুক্ষণ পর তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, আক্ষেপ, শত আক্ষেপ! দূত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া উপকৃত হইল আর প্রাপক বঞ্চিত রহিল। এই দুনিয়া, দুনিয়ার শাসন ক্ষমতা এবং উহার শান-শওকত দ্বারা আমার কি লাভ হইবে? ক্রমে সকল কিছুই তো একদিন শেষ হইয়া যাইবে এবং আমাকে একা দুনিয়া হইতে বিদায় হইতে হইবে।

ওব্বাদ তালেকানী বলে, হযরত সুফিয়ান ছাওরী আমাকে যেইভাবে চিঠি দিয়াছিলেন, চিঠিটি আমি হুবহু সেইভাবেই খলীফার হাতে দিলাম। খলীফা পত্রটি পাঠ করিতে করিতে অঝোর ধারায় কাঁদিতে লাগিলেন এবং ভয়-আশংকা ও দুর্ভাবনায় তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

খলীফার দরবারে উপস্থিত জনৈক সভাসদ আরজ করিল, হে আমীরুল মোমেনীন! এই পত্র দ্বারা সুফিয়ান ছাওরী আপনাকে অপমান করিয়াছে। এই বেআদবীর জন্য তাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। আপনি যদি হুকুম করেন, তবে আমরা এখুনি তাহাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আপনার দরবারে আনিয়া হাজির করিব– যেন তাহার অবস্থা দেখিয়া অন্য সকলেও শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে যেন আর কেহ আমীরুল মোমেনীনের সঙ্গে বেআদবী করার সাহস না পায়।

খলীফা হারুনুর রশীদ লোকটির দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, যেই ব্যক্তি তোমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া প্রতারিত হইবে, সে অত্যন্ত দুর্ভাগা। তোমরা হযরত সুফিয়ান ছাওরীকে এখনো চিনিতে পার নাই। তিনি একজন উঁচু মানের আলেম এবং শরীয়তের যথার্থ পাবন্দ। আমি তাঁহার কাজে বাঁধা দিয়া নিজের পরিণতি খারাপ করিতে চাহি না।

বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তীতে খলীফা হারুনুর রশীদ হযরত সুফিয়ান ছাওরীর উপরোক্ত পত্রটি সর্বদা সঙ্গে রাখিতেন এবং প্রতি নামাজের পর উহা পাঠ করিতেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই নিয়ম পালন করিয়াছেন।

যেই ব্যক্তি প্রতি কাজে আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজের নফসের প্রতি নজর রাখে আল্লাহ পাক তাহার উপর রহম করুন। পরকালে মানুষের প্রতিটি কাজেরই হিসাব লওয়া হইবে। দুনিয়াতে যেই ব্যক্তি নেক আমল করিয়াছে, পরকালে সে উহার বিনিময় লাভ করিবে। আর বদকারকে অবশ্যই তাহার পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

খলীফার প্রতি বাহলুল মজনূনের নসীহত

আব্দুল্লাহ ইবনে মেহরান বলেন, একবার খলীফা হারুনুর রশীদ হজ্ব হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় কয়েক দিনের জন্য কুফায় যাত্রা বিরতি করেন। পরে তথা হইতে যাত্রা করিলে কুফাবাসীগণ তাহাকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে শহরের উপকণ্ঠ পর্যন্ত আগাইয়া আসে। বাহ্লুল মজনূনও সেখানে উপস্থিত ছিল। এই সময় শহরের বালকরা তাহাকে লইয়া তামাশা করিতেছিল। পরে খলীফার সওয়ারী আসিলে বালকরা সরিয়া যায়। বাহলুল উচ্চ স্বরে খলীফাকে ডাকিয়া বলিল, হে আমীরুল মোমেনীন! খলীফা জবাব দিলেন, লাব্বাইক হে বাহলুল! বাহলুল বলিল, আমি হাদীস শুনিয়াছি আয়মান ইবনে নায়েল হইতে, তিনি কুদামা ইবনে আব্দুল্লাহ আমেরী হইতে। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়াছি। তিনি উটের উপর সওয়ার ছিলেন। এই সময় কোনরূপ ধাক্কাধাক্কি, মারধর কিংবা হটো-পথছাড় ইত্যাদি হৈ-হল্লার কিছুই ছিল না।

আমীরুল মোমেনীন! এই সফরে আপনার পক্ষে অহংকার ও শান-শওকত প্রদর্শনের পরিবর্তে বিনয় অবলম্বন করা উত্তম।

বর্ণনাকারী বলেন, বাহলুল মজনূনের উপরোক্ত নসীহত শোনার পর খলীফা হারুনুর রশীদ কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন, বাহলুল! আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, আমাকে আরো কিছু নসীহত কর। বাহলুল বলিল, উত্তম হে আমীরুল মোমেনীন! আল্লাহ যাহাকে ধনসম্পদ ও দৈহিক সৌন্দর্য দান করিয়াছেন, সে যদি ঐ সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে এবং দৈহিক সৌন্দর্যে সংযমী হয়, তবে আল্লাহ পাক তাহার নাম বিশেষ ব্যক্তিদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া লন। খলীফা হারুনুর রশীদ বাহলুলের এই হেকমত পূর্ণ কথায় প্রীত হইয়া তাহাকে কিছু হাদিয়া দিতে চাহিলেন। বাহলুল তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল, ইহা আপনি যাহার নিকট হইতে লইয়াছেন তাহাকে ফেরৎ দিয়া দিন, ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। খলীফা বলিলেন, বাহলুল! তোমার কোন করজ থাকিলে বল, আমি তাহা পরিশোধ করিয়া দিব। বাহলুল বলিল, কুফার আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, ঋন পরিশোধের জন্য ঋণ করা ঠিক নহে। অবশেষে খলীফা বলিলেন, তবে তোমার নিয়মিত চলার জন্য আমি কিছু ভাতা নির্ধারণ করিয়া দেই। বাহলুল আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া বলিল, হে আমীরুল মোমেনীন! আমি এবং আপনি উভয়ই আল্লাহ তায়ালার পরিবারভুক্ত। সুতরাং ইহা কোনক্রমেই সম্ভব নহে যে, তিনি আপনার কথা স্মরণ রাখিবেন আর আমাকে ভুলিয়া যাইবেন। বাহলুলের এই জবাব শুনিয়া খলীফা আর কিছুই বলিলেন না এবং নীরবে যাত্রা শুরু করিলেন।

এক যুবকের নসীহত ও শাহাদাত

আবুল আব্বাস হাশেমী ছালেহ ইবনে মামুনের নিকট বর্ণনা করেন, একদিন আমি হারেস মোহাসেবীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি নিয়মিত নিজের নফসের পাপ-পুণ্যের হিসাব গ্রহণ করেন কি? জবাবে তিনি বলিলেন, হাঁ এক সময় করিতাম বটে। আমি আরজ করিলাম, এখন করেন না কেন? তিনি বলিলেন, এখন আমি নিজেকে গোপন করি। অতঃপর তিনি এক বিস্ময়কর ঘটনার বর্ণনা দিয়া বলেন, একদিন আমি আমার নির্জন কক্ষে বসা ছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে এক সুদর্শন যুবক আগমন করিল। সে আমাকে ছালাম দিয়া একেবারে আমার সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছ? সে বলিল, আমি একজন পর্যটক। আমি এমন লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া বেড়াই, যাহারা নির্জনে আল্লাহর এবাদতে নিমগ্ন থাকেন। কিন্তু এখানে আসিয়া আমি আপনাকে দৃশ্যতঃ কোন এবাদতে নিমগ্ন দেখিতে পাই নাই। আপনি কোন্ ধরনের এবাদত করেন? আমি জবাব দিলাম; আমার উপর কোন বালা-মুসীবত আসিলে আমি

তাহা প্রকাশ না করিয়া গোপন রাখি এবং যাহা উপকারী ও কল্যাণকর তাহা হাসিল করি। আমার এই জবাব শুনিয়া যুবক বিকট স্বরে চিৎকার দিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর সে বলিল, পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত এই সুবিশাল পৃথিবীর অপর কেহ এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আছে কিনা তাহা আমার জানা নাই। আমি বলিলাম, আল্লাহওয়ালাদের নিয়ম হইল, তাহারা নিজেদেরকে অপরের নিকট হইতে গোপন রাখেন এবং আল্লাহর নিকটও দোয়া করেন যেন মানুষের নজর হইতে তাহাদিগকে গোপন রাখা হয়। সুতরাং তুমি কেমন করিয়া তাহাদের অবস্থা জানিতে পারিবে? আমার এই কথা যুবকের উপর পূর্বাধিক ক্রিয়া করিল এবং সে বিকট স্বরে চিৎকার দিয়া জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। এই অজ্ঞান অবস্থায় ক্রমাগত দুই দিন সে আমার এখানে পড়িয়া রহিল। দুই দিন পর যখন হুশ হইল, তখন মল-মুত্রে তাহার দেহ ও পরিধেয় বস্ত্র নাপাক হইয়া গিয়াছিল। আমি তাহাকে নূতন কাপড় দিয়া বলিলাম, এই কাপড় আমি নিজের কাফনের জন্য রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমার নিজের উপর তোমাকে প্রাধান্য দিতেছি। তুমি পাক-সাফ হইয়া এই কাপড় পরিধানপূর্বক বিগত দুই দিনের কাজা নামাজ আদায় কর।

যুবক গোসল করিয়া নামাজ আদায়ের পর এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তুমি কোথায় যাইবে? সে এই কথার সরাসরি কোন জবাব না দিয়া বলিল, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন। আমি কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার সঙ্গে রওনা হইলাম।

যুবক আমাকে লইয়া খলীফা মামুন রশীদের দরবারে গিয়া হাজির হইল। সে খলীফাকে ছালাম করিয়া বলিল, হে জালেম! আমি যদি তোমাকে জালেম না বলি, তবে আমি নিজেই জালেম। আমি তোমার বিষয়ে কোনরূপ অবহেলা করা হইতে আল্লাহর আশ্রয় চাহিতেছি ও প্রার্থনা করিতেছি। তুমি কি এতদ্‌সত্ত্বেও আল্লাহকে ভয় করিবে না যে, তিনি জমিনের উপর তোমাকে মানুষের শাসক নিযুক্ত করিয়াছেন? ..... অর্থাৎ এইভাবে কঠোর ভাষায় খলীফাকে কতক নসীহত করার পর সে তথা হইতে প্রস্থানোদ্যত হইল। আমি দরজার পাশেই বসা ছিলাম। খলীফা যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে এবং এখানে কেন আসিয়াছ? যুবক বলিল, আমি একজন পর্যটক। আমি পূর্ববর্তী বুজুর্গানে দ্বীনের অবস্থা পাঠ করিয়া দেখিয়াছি (যে, তাহারা কেমন করিয়া আমীর ও শাসক শ্রেণীকে নসীহত করিতেন।) কিন্তু আমার মধ্যে তাহাদের (সেই) আমল বিদ্যমান ছিল না। 'এই কারণে আমি তোমাকে নসীহত করার এরাদা করিয়া তাহা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি।

হারেস মোহাসেবী বলেন, যুবকের এই দুঃসাহস দেখিয়া খলীফা তাহাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সেই কাফনের পোশাকের সঙ্গেই যুবককে

তৎক্ষণাত হত্যা করা হইল। পরে তাহার লাশ বাহির করিয়া শহরে নিয়া ঘোষণা দেওয়া হইল– এই লাশের কোন ওয়ারিশ থাকিলে তাহারা আসিয়া লাশ গ্রহণ করিতে পারে। আমি এই ঘোষণা শোনার পরও লাশের দায়িত্ব গ্রহণ করার সাহস করিতে পারি নাই। অবশেষে যখন কেহই লাশ গ্রহণ করিল না, তখন শহরের গরীব মুসলমানগণ যুবকের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করিল। কাফন-দাফনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আমি শরীক ছিলাম। কিন্তু কাহাকেও এই কথা জানিতে দেই নাই যে, এই পরদেশী যুবক জীবনের শেষ ভাগের কিছু সময় আমার সঙ্গে কাটাইয়াছে এবং সেই সুবাদে সে আমার পরিচিত ছিল। যাহাই হউক, যুবকের দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর আমি গোরস্তানের পার্শ্ববর্তী মসজিদে চলিয়া গেলাম। যুবকের নির্মম হত্যাকাণ্ডের কারণে আমার মন খুবই পেরেশান ছিল। আমি ক্লান্ত দেহে মসজিদের এক কোণে শয়ন করিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখে নিদ্রা নামিয়া আসিল। অতঃপর স্বপ্নযোগে আমি সেই যুবককে বেহেশতী হুর পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। যুবক আমাকে ডাকিয়া বলিল, হে হারেস! আল্লাহর কসম, আপনি সেইসব ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য, যাহারা আল্লাহর আনুগত্য করে কিন্তু উহার ফল গোপন রাখে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সেইসব লোকেরা এখন কোথায়? সে বলিল, তাহারা এখুনি এখানে আসিবে। একটু পরই আমি দেখিতে পাইলাম, কতক সওয়ারীর একটি কাফেলা আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কে? তাহারা জবাব দিল, "নিজেদের অবস্থা গোপনকারী"। অতঃপর তাহারা যুবকের দিকে ইশারা করিয়া বলিল, এই যুবক তোমার কথায় প্রভাবিত হইয়াছিল এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল। পরে এই অপরাধে (?) তাহাকে হত্যা করা হয়। এখন এই যুবক আমাদের সঙ্গী এবং তাহার হত্যাকারীর 'দুর্ভাগ্য' আল্লাহর গজবকে আহবান করিতেছে।

হযরত আবুল হাসান নূরীর ঘটনা

মোহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম মুকরী বর্ণনা করেন, প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত আবুল হাসান নূরী খুব কম কথা বলিতেন এবং অহেতুক কর্ম পরিহার করিয়া চলিতেন। একান্ত আবশ্যক না হইলে কাহারো নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন না এবং মানুষের দোষ খুঁজিয়া বেড়াইতেন না। তবে কোন অন্যায় ও গর্হিত কর্ম দেখিলে উহাতে বাঁধা দিতেও তিনি কিছুমাত্র পরওয়া করিতেন না। একদিন তিনি নদীর তীরে বসিয়া অজু করিতেছিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একটি নৌকায় অনেকগুলি মটকা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। প্রত্যেকটি মটকার গায়ে "লুতফ" শব্দটি লেখা ছিল। যেহেতু কোন বস্তু বা পণ্যের নাম 'লুতফ' আছে বলিয়া তাহার জানা ছিল না, এই কারণে তিনি

মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মটকাগুলিতে কি আছে? মাঝি বলিল, মটকায় কি আছে তাহা জানিয়া আপনার কি হইবে? আপনি নিজের কাজ করুন। মাঝির কুশলী জবাব শুনিয়া হযরত নূরীর সন্দেহ আরো বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, আমি এমনিই জানিতে চাহিতেছি। তুমি যদি আমাকে বলিয়া দাও– মটকায় কি আছে, তবে আমার একটি অজানা বিষয় জানা হইবে, অথচ তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। মাঝি বলিল, ভারি মজার কাণ্ড তো; মনে হইতেছে, আপনি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি অতি আগ্রহী এক সুফী মানুষ। আপনার যদি এতই আগ্রহ থাকে তবে শুনুন। ঐ মটকাগুলিতে শরাব আছে এবং তাহা খলীফা মু'তাজাদের জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে। হযরত নূরী জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাতে কি সত্যি শরাব আছে? মাঝি বলিল, হাঁ! উহাতে সত্যিই শরাব আছে বটে। শরাবের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর হযরত নূরীর মনে চাঞ্চল্য দেখা দিল। তিনি মাঝিকে বলিলেন, তোমার পাশে রক্ষিত ঐ মুগুরটি আমার হাতে দাও। এই কথা শুনিয়া মাঝি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার চাকরকে বলিল, মুগুরটি তাহার হাতে দাও; দেখি তিনি কি করেন। হযরত নূরী মুগুরটি হাতে পাওয়ামাত্র নৌকায় উঠিয়া একে একে সবগুলি মটকা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং একটি মাত্র মটকা অক্ষত রাখিয়া তবে ক্ষান্ত হইলেন।

ঘটনার আকস্মিতায় মাঝি ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া চিৎকার করিতে লাগিল। তাহার চিৎকার শুনিয়া আশেপাশের লোকেরা ছুটিয়া আসিল। কিন্তু এতক্ষণে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছিল। সংবাদ পাওয়ার পর স্থানীয় প্রশাসক ইবনে বিশর আফলাহ অকুস্থল পরিদর্শনে আসেন। ঘটনার বিবরণ শুনিয়া তিনি হযরত নূরীকে গ্রেফতার করিয়া খলীফা মুতাজাদের দরবারে চালান করিলেন। খলীফা মু'তাজাদ সম্পর্কে এইরূপ প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি আগে তরবারী চালনা করেন এবং পরে কথা বলেন। এই কারণে সকলেরই নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, খলীফা হযরত নূরীকে হত্যা না করিয়া ছাড়িবেন না।

হযরত আবুল হাসান নূরী বলেন, আমাকে যখন খলীফার দরবারে হাজির করা হইল, তখন খলীফা একটি লৌহনির্মিত আসনে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাহার হাতেও ছিল একটি লৌহদণ্ড। তিনি আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করার পর রাশভারী কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমি বলিলাম, আমি একজন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে এই দায়িত্ব কে দিয়াছে? আমি বলিলাম, যিনি আপনাকে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়াছেন। আমার এই জবাব শোনার পর খলীফার মাথা নত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই কাণ্ড করিলে কেন? আমি বলিলাম, আপনার মঙ্গলের জন্য। তিনি উহার ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলে আমি বলিলাম, খলীফাকে যেই পরিমাণ অনিষ্ট হইতে রক্ষা

করা আমার পক্ষে সম্ভব– সেই পরিমাণ কর্ম সম্পাদন করা আমি আমার কর্তব্য মনে করিয়াছি। সে মতে শরাবের মটকাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা আমার ক্ষমতার ভিতর ছিল বিধায় আমি সেইগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলি। খলীফা এইবারও নীরবে মাথা নত করিলেন। মনে হইল যেন তিনি আমার কথাগুলির যথার্থতা পর্যালোচনা করিয়া দেখিতেছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অক্ষত মটকাটির ভিতরও তো শরাব ছিল, সেইটি ভাঙ্গিলে না কেন? এইবার আমি বলিলামঃ হে আমীরুল মোমেনীন! আমি যখন প্রথমে মটকা ভাঙ্গিতে অগ্রসর হই, তখন আমার মন আল্লাহ পাকের জালাল ও প্রতাপে পরিপূর্ণ ছিল এবং আমি ছিলাম পরকালে আল্লাহ পাকের নিকট জবাবদিহিতার ভয়ে আচ্ছন্ন। সেই সময় আমার মনে এমন ভীতির উদ্রেক হয় নাই যে, এইগুলি খলীফার মটকা এবং আমার এই আচরণে তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন। অর্থাৎ সেই সময় আমি সর্বপ্রকার পার্থিব ভয়-ভীতি হইতে মুক্ত ছিলাম এবং সেই কাজে শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁহার নির্দেশ পালনই ছিল আমার লক্ষ্য। এই কারণেই আমি মটকাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলার সাহস করিতে পারিয়াছি। কিন্তু যখন শেষ মটকাটি ভাঙ্গার জন্য মুগুর উত্তোলন করি, তখন আমার মনে এই অহংকার আসিল যে, "আমি তো স্বয়ং খলীফার মটকা ভাঙ্গিয়া ফেলার দুঃসাহস করিতে পারিয়াছি"। আমার মনে এই অহংবোধ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার হাত গুটাইয়া লই। অর্থাৎ সেই সময়ও যদি আমার মনে পূর্ববৎ অবস্থা বিদ্যমান থাকিত, তবে ঐ একটি মটকা কেন, যদি সমস্ত পৃথিবীও শরাবের মটকায় পরিপূর্ণ থাকিত, তবে সেই সমুদয় মটকাও আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম এবং এই ক্ষেত্রে আমি কোন মানবীয় শক্তির কিছুমাত্র পরওয়া করিতাম না।

হযরত নূরী বলেন, আমার উপরোক্ত বক্তব্যের পর খলীফা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যাও, এখন হইতে তোমাকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হইল। এই কাজে কেহই তোমাকে বাধা দিবে না। খলীফার এই কথার জবাবে আমি বলিলাম, আমীরুল মোমেনীন! এখন হইতে আর তো আমি এই কাজ করিব না। কেননা, ইতিপূর্বে আমি অন্যায়ের প্রতিরোধ করিয়াছি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে। আর এখন তাহা করা হইবে আপনার নির্দেশে। আমার এই কথায় যেন খলীফা অনেকটা দমিয়া গেলেন। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে এখন তুমি কি করিতে চাও? আমি বলিলাম, আমি কিছুই করিতে চাই না। আমাকে কেবল নিরাপদে যাইতে দিন, খলীফা আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবুল হাসান নূরী খলীফার দরবার হইতে বাহির হওয়ার পর সরাসরি বসরা নগরী চলিয়া যান এবং সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন। খলীফা মু'তাজাদের ইন্তেকালের পর তিনি পুনরায় বাগদাদ ফিরিয়া আসেন।

উপরে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের কতক ঘটনা উল্লেখ করা হইল। এইসব ঘটনা দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহওয়ালাগণ পরিপূর্ণ এখলাসের সহিত এই কাজ করিয়াছেন এবং এই কাজে তাহারা পার্থিব লোভ লালসার কিছুমাত্র পরওয়া করেন নাই। আল্লাহ পাকের রহমতই ছিল তাহাদের একমাত্র ভরসা। এই কারণেই তাহারা প্রবল শক্তিধর প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় নির্ভিকচিত্তে অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিলেন। এই কাজে জীবনের উপর কোনরূপ ঝুঁকি আসিলে উহাকে তাহারা শাহাদাতের সৌভাগ্য মনে করিয়াছেন। এই এখলাসের কারণেই তাহাদের কথায় তাছীর হইয়াছে এবং কঠিন হইতে কঠিন প্রাণও তাহাদের নসীহত কবুল করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থা হইল, পার্থিব লোভ-লালসা যেন আলেমদের মুখে তালা লাগাইয়া দিয়াছে। এখন তাহারা হক কথা না বলাই নিরাপদ মনে করিতেছে। আর বলিলেও তাহাদের কথায় কোন কাজ হইতেছে না। কেননা তাহাদের কথার সহিত অন্তরের অবস্থার কোন মিল নাই। দেশের শাসকবর্গ যখন খারাপ হয় তখন উহার প্রভাবে প্রজাসাধারণও বিপথগামী হয়। আর শাসকবর্গ খারাপ হয় আলেমগণ খারাপ হওয়ার কারণে। আলেমগণের অন্তরে যখন ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের লিপ্সা প্রবল হয়, তখনই তাহাদের নৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। তো দেখা যাইতেছে, দেশের শাসক ও প্রজা খারাপ হওয়ার মূলে আলেমগণ। আলেমগণ খারাপ হইলে উহার প্রভাবে শাসক শ্রেণী খারাপ হইবে এবং শাসক শ্রেণীর নৈতিক বিপর্যয় ঘটিলে উহার কুপ্রভাবে দেশের প্রজাসাধারণও বিপথগামী হইবে। যেই ব্যক্তির অন্তরে দুনিয়ার মোহাব্বত প্রবল হইবে সেই ব্যক্তি (নৈতিক শক্তির অভাবে) একজন সাধারণ মানুষকেও আদেশ-নিষেধ করিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং তাহার পক্ষে আমীর ও শাসক শ্রেণীকে আদেশ-নিষেধ করার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

এখন আমি এই প্রসঙ্গটি শেষ করিতেছি। আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের সকলকে বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর আমল করার তাওফীক দান করেন। আমীন!

।। **আল্লাহর অপার অনুগ্রহে সমাপ্ত** ।।